হিরণ্যগর্ভ
নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
৩০শে আষাঢ়, ১৪২৩

Hiranyagarbha
Volume 9, No. 2
हिरण्यगर्भ
नवम वर्ष, द्वितीय संख्या
तारिख-१५जुलाइ, २०१६

৩০শে আষাঢ়, ১৪২৩ 15th July, 2016

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	শ্রীরামদূত হনুমান	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	07
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	শ্রীশ্রীকিশোরী মোহন	08
	মরুৎগণের কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
	মুরু বধ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	11
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	13
	নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	14
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	15
	শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	16
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	18
	রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	19
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	22
	গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ	শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য	23
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	24
हिन्दी विभागः—	श्रीरामदूत हनुमान	श्रीविमलानन्द	26
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीश्री किशोरी मोहन	28
	गुरुगीता	श्रीश्रीमा सर्वाणी	29
	मरुत-गणों की कथा	श्रीमती ज्योति पारेख	30
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	33
	श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	35
	परमब्रह्म के साक्षी	श्रीविमलानन्द	37
	मुरु वध	श्रीमती ज्योति पारेख	37
	नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	38
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	39
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	40
English Section ः—			
	Hansa-Anu-Maan – Sadguru's Gift to a Sadhaka	Dr. Partha Pratim Chakrabarti	42
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	46
	My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	47
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	48
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	49

ISBN No. 978-93-80373-90-4 Cover : Sri Hanuman

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

বর্ষণমন্দ্রিত শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশকটাহে ধ্বনিত মেঘডম্বরু মাঝে ভেসে আসে পুণ্য শঙ্খধ্বনি। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় গুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্ন সমাগত। পরমপুণ্য আর এক লগ্ন আমরা সদ্য অতিক্রম করে এসেছি — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও আমাদের গুরুমায়ের শুভ জন্মতিথি। ধূপ-দীপ, পুষ্প, চন্দনের সুগন্ধে ও সান্ধ্য-ভক্তিগীতির সমর্পণের মধ্যে দিয়ে আমরা স্মরণ করেছি সেই পুণ্য-লগ্ন — প্রার্থনা করেছি তাঁদের অনুকম্পা। অসুরশক্তির আস্ফালনে সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব যখন সঙ্কটময়, গুরুমহাত্মাগণের অখিল ক্রিয়াপ্রভাব সকল বিপদসঙ্কুলতা থেকে ভক্তিবিনম্র মানবকুলকে রক্ষা করুন - এটাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

গুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে পরমপূজ্য শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা, মহাবতার বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়, শ্রীশ্রীসরোজ বাবা ও শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তিবিনম্রচিত্তে আমরা প্রণতঃ হই — প্রার্থনা করি যেন তাঁদের আশীর্বাদে আমাদের সকলের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়। সততা, নিঃস্বার্থতা, চিত্তের শুদ্ধতা ও সমর্পণের বীজমন্ত্র স্মরণ করে আমরা যেন আধ্যাত্মিক লক্ষ্যপথে অচঞ্চলভাবে অগ্রসর হতে পারি।

হিরণ্যগর্ভের এই বিশেষ সংখ্যাটি আমরা নিবেদন করেছি পরম ভক্তবৎসল, দাস্যভাবের পরমাদর্শ-বহনকারী, সঙ্কটমোচন, মহাবীরস্বামী শ্রীশ্রীহনুমানজীর চরণপদ্মে। মহাবল-বজরঙ ব্রহ্মার বরে শত্রুগণের ভয়োৎপাদক ও মিত্রগণের অভয়কারী, অজেয় কামরূপ, অব্যাহতগতি ও পরম কীর্তিমান। সৃষ্টিতত্ত্বে তাঁর আসল পরিচয় যে তিনি শিবসাযুয্যবান অযোনিসম্ভবা ঋষি 'নন্দী'। সাধনমার্গের পরিপূর্ণতার পথে এই নন্দী ঋষিই ভগবৎ রামলীলায় রুদ্রাবতার রূপে এক সুমহান চরিত্র অবলম্বনকরতঃ "হনুমান" চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ভক্তিযোগের বৈরাগ্য ও দাস্যভাবের সাক্ষাৎ প্রতিভূ - সগুণব্রহ্ম সনাতনের এক অনন্যসাধারণ রূপ।

আজ গুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে আমরা তাঁর শ্রীচরণে আভূমি প্রণতঃ হই এবং প্রার্থনা করি, "হে পরম ব্রহ্মর্ষি, আপনি আমাদের শুদ্ধ-সমর্পিত, তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা করুন - আধ্যাত্মিক পথে আমাদের সঙ্কটমোচনপূর্বক আমাদের কৃপাধন্য করুন।"

"পবন তনয় সঙ্কট হরণ, মঙ্গল মূরতি রূপ।
রাম-লখন-সীতা সহিত, হৃদয় বসহু সুরভূপ।।"

We hear the clarion call of conch shells amidst the rumblings of thunder from the overcast sky in the rainy month of Sravana. The auspicious event of Guru Purnima has arrived.

A few days back, the Ashramites celebrated with piety and verve the Snanyatra ceremony of Lord Jagannath along with the advent ceremony of Sree Sree Maa. Offering of flowers, lamp and incense and rendition of spiritual songs by Maa's disciples and devotees marked this auspicious occasion. We prayed for the blessings of all saints and savants to guard us against the present turbulent times when humanity is standing at the crossroads of existence.

On the forthcoming occasion of Guru Purnima, let all Gurubhais and Gurubons offer our humble obeisance to the lotus feet of Shri Shri Nanga Baba, Mahavatar Babaji Maharaj, Shri Shri Lahiri Mahashay, Shri Shri Saroj Baba and Sree Sree Maa. We pray for their blessings so that the virtues of purity, honesty, beatitude and surrender enlighten our minds in our spiritual journey forward.

This issue of Hiranyagarbha is being dedicated to the lotus feet of "Mahavirswami Sankatmochan" Lord Hanuman, the divine sage, who stands as the epitome of all virtues, chastity, surrender and service to the Supreme Lord. Blessed with the divine boon of Lord Brahma, He always protects His devotees, destroys the evils and is omnipresent. Very few are aware that He is none other than the great ancient sage, Nandi, the divine escort of Lord Shiva. For His spiritual fulfillment, He descended amongst us in the manifestation of Lord Hanuman during the divine incarnation of Lord Rama in the Treta Yuga to set forth a sublime ideology of surrender and service to God.

Let us bow our heads to this great saint and pray to Him for His blessings to eliminate all obstacles in the austere path of spirituality and to bestow us with courage and purity towards our pious goal.

"Pavana-tanaya Sankataharana, Mangal Murati Rup
Ram-Lakhan-Sita-sahita Hriday Basahu Sura Bhup"

শ্রীরামদূত হনুমান

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

'হনুমান' পুরাণের এক অতি বিশিষ্ট মহান ভগবৎ চরিত্র। এই অতিঅদ্ভুত অবতার চরিত্রের জন্মকথাও অত্যদ্ভুত। কথিত আছে যে সুমেরু পর্বতে বানররাজ কেশরী থাকিতেন। এই বানররাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ ও বায়ুদেবের ঔরসজাত পুত্র ছিলেন 'হনুমান'। হনুমানের মাতার নাম অঞ্জনা বা অঞ্জনী। অঞ্জনা বানরশ্রেষ্ঠ কুঞ্জরের দুহিতা ছিলেন। একদিন ফল আহরণার্থ গহন বনে অঞ্জনা বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় বায়ুদেবও সেখান দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় অঞ্জনার অপ্সরাতুল্য রূপলাবণ্য দেখিয়া বায়ু তখন অতি পুলকিত হইলেন। অঞ্জনার রূপে মুগ্ধ হইয়া বায়ুদেব (পবনদেব) তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে অঞ্জনা বায়ুকে তিরস্কার করেন। তখন বায়ু বলেন যে তিনি অঞ্জনার সঙ্গে মনে মনেই মিলিত হইয়াছেন, ইহাতে তাহার কোন ক্ষতির সম্ভবনা নাই। ইহার ফলে তাঁহার অতি পরাক্রমশালী ও বায়ুর মতই বেগবান এক পুত্র হইবে। তদনন্তর এই কথা বলিয়া বায়ু প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন পর অঞ্জনা গুহা মধ্যে হনুমানকে প্রসব করিলেন। শিশুপুত্র জন্মিলে পরে মাতা অঞ্জনা ফলমূল আহার সংগ্রহের জন্যে গুহা হইতে বাহির হইলে পরে তখন সদ্য প্রসূত হনুমান ক্ষুধার্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আকাশে নবোদিত সূর্য্যকে দেখিয়া হনুমান তাঁহাকেই ফল ভ্রমে গ্রহণ করিবার জন্যে লম্ফ প্রদান পূর্বক বহু শতযোজন ঊর্ধ্বে আকাশে উঠিলেন। হনুমান আকাশে উত্থিত হইলে পবন স্বীয় পুত্রের প্রতি মমতার বশবর্তী হইয়া তাহার অনুগামী হন। হনুমান ক্রমে আকাশে গমন করিতে করিতে সূর্য্যের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্য তাহাকে বালক বিবেচনায় দগ্ধ করিলেন না। এমন সময় রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিবার জন্যে উদ্যত হন; কিন্তু হনুমানকে সূর্য্যরথে দেখিয়া, তাহাকে নিজ প্রতিদ্বন্দী মনে করিয়া তখন রাহু ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া অভিযোগ করেন। ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে সূর্য্যসমীপে গমন পূর্বক হনুমানকে বজ্রদ্বারা প্রহার করেন। সেই বজ্রাঘাতে পবন তনয়ের বাম হনু (চোয়াল/চিবুক) ভগ্ন হইয়া যায় এবং তিনি ভূতলে জ্ঞানশূন্য হইয়া পতিত হইয়া যান। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া পবনদেব আহত পুত্রকে লইয়া পর্বত গহ্বরে লুক্কায়িত হন।

তখন সর্বভূতে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়। বায়ুর অভাবে ত্রিলোকে হাহাকার পড়িয়া যায়। বায়ু সঞ্চালন বন্ধ হইলে দেবগণ সমূহ বিপদাশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তখন ব্রহ্মা দেবগণসহ পর্বতগুহায় পবন সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া হস্তস্পর্শ দ্বারা বায়ুপুত্রের জীবন দান করিলেন। বায়ুও তখন আনন্দিত হইয়া পুনরায় জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই হনুমানকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে হনুমান শত্রুগণের ভয়োৎপাদক ও মিত্রগণের অভয়কারী, অজেয় কামরূপ, কামচারী, কামগামী অব্যাহতি গতি ও কীর্তিমান হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন যে তাহার বজ্রাঘাতে হনু ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া এই মহাবল বায়ুপুত্র 'হনুমান' নামে বিখ্যাত হইবে এবং ইন্দ্রের বজ্রের অবধ্য হইবে। সূর্য্য বলিলেন, ''আমি ইহাকে মদীয় অংশের শততম অংশ তেজ প্রদান করিতেছি এবং যখন এই বায়ুপুত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে, তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব। তাহাতে হনুমান অসাধারণ বাগ্মীতা লাভ করিবে।'' বরুণদেব বলিলেন যে তাহার পাশ ও জল হইতে অযুতশতবর্ষেও হনুমানের মৃত্যু হইবে না। যমের বরে তিনি যমদণ্ডের অবধ্য হইলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি রোগহীনতা ও অবিষন্নতাও লাভ করিলেন। কুবের বলিলেন যে যুদ্ধে হনুমান তাঁহার গদার অবধ্য হইবে। শঙ্কর ও বিশ্বকর্মাও বলিলেন যে পবনতনয় তাঁহাদের অস্ত্রাদির অবধ্য হইবে। দেবগণ এইরূপে বর প্রদান করিলে পর পবন তাঁহার পুত্রকে অঞ্জনার হস্তে

সমর্পণপূর্বক দেবগণের বরপ্রদান বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বরলাভ করিয়া বলশালী হইয়া হনুমান ঋষিদের আশ্রমে উপদ্রব করিতে থাকেন। কেশরী ও পবন তাঁহাকে নিষেধ করিলেও হনুমান তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবশেষে হনুমানের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভৃগু ও অঙ্গিরা বংশীয় ঋষিগণ হনুমানকে শাপ দিলেন। তাঁহাদের অভিশাপে হনুমান দীর্ঘকাল নিজ বল ও কীর্তি সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত থাকেন। পরে রাম লীলায় সীতা উদ্ধারের সময়ে শ্রীরামদূত হইয়া সাগর লঙ্ঘন পূর্বে জাম্ববান তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলে তখন হনুমান নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী বোধ করিয়া 'রাম-নামে' এক লাফে সাগর লঙ্ঘন করেন।

সূর্য্যের শতাংশ তেজ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া হনুমানকে 'রুদ্রাবতার' বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা অবতার হইয়া থাকেন তাঁহাদের আবির্ভাবের পশ্চাতে কারণেরও কারণ থাকে, কারণ একাধিক কারণবশতঃ অবতার তাঁহার অবতারস্বরূপ দেহ ধারণ করিয়া থাকেন এবং সেই দেহ হয় সগুণ ব্রহ্মের একটি নব রূপায়ণ এবং যাহার মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান সন্নিবেশিত থাকে। অবতার দেহ সাধারণতঃ ভগবৎলীলায় অংশগ্রহণের জন্যই ধারণ করা হয়।

'রুদ্র' বলিতে ভর্গদেবের প্রকাশরূপ শিবরূপকেও বোঝায়। তাই হনুমান শিবাবতার। এই রুদ্ররূপী শিবস্বরূপের পশ্চাতে মুনিঋষিগণের উপলব্ধিত এক বিরাট সত্য নিহিত রহিয়াছে; যোগগম্য উপলব্ধির আলোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে 'হনুমান' একজন অতি প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি। ভগবৎস্বরূপের পথে সেই ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষির সাধনা রুদ্রাবতার রূপে শিবসাযুজ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রামলীলায় এক সুমহান চরিত্র অবলম্বনকরতঃ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তিযোগের বৈরাগ্য এবং দাস্যভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি হইলেন 'শ্রীহনুমান'। ইহাভিন্ন শ্রীরামলীলার যৌগিক-তাত্ত্বিক রূপে হনুমানের বহু অবদান আমরা দেখিতে পাই। সাধারণভাবে 'হনু' শব্দের অর্থ হইল গণ্ডস্থলের উপরিভাগ অথবা চোয়াল বা চিবুক। আর যৌগিক তত্ত্বগত ভাবে 'হনুমান' কথার অর্থ হইল 'হং-কার' (বা হংসের হং-যুক্ত) সংযুক্ত অণুর (ব্রহ্মাণুর) মান; অর্থাৎ আত্মসত্তার মান বা আত্মার স্বরূপের মান বা পরিধি। যেটি একটি ব্রহ্মাণুর স্বরূপ নির্ণয়কারী তাই হনুমান শিবরূপ হইয়াও শক্তির প্রতীক, 'মান'রূপী আত্মশক্তির প্রকাশিত তত্ত্বগত রূপ, সগুণ ব্রহ্ম সনাতনের এক অদ্ভুত অনন্য অসাধারণ স্বরূপ, পঞ্চাননরূপী বিরাট পুরুষের আরও একটি প্রতিভূ।

প্রাচীন যুগে শিলাদ নামে এক ধর্মাত্মা মহান ঋষি ছিলেন। একদিন তিনি শিবলোক হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহার পিতৃগণকে নরকে লম্বমান অবস্থায় দেখিতে পান। তাঁহারা শিলাদকে বলিলেন যে, তিনি দার-পরিগ্রহ না করায় তাঁহাদের ঐরূপ গতি হইয়াছে। তজ্জন্য উহারা শিলাদকে পুত্র লাভার্থ মহাদেবের আরাধনা করিতে বলিলেন। পিতৃগণের কথায় মহর্ষি শিলাদ তখন শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং শিলাদ শিবতুল্য অমর অযোনিজ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব শিলাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া চলিয়া গেলে মহর্ষি শিলাদ এক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গলমার্গে এক পরম তেজস্বী কুমারকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। প্রথমে শিলাদ সেই শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। পরে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি সেই শিশুকে গ্রহণ করিলেন। সেই কুমার তাঁহার আনন্দকর হওয়াতে তিনি তাহার নাম রাখিলেন 'নন্দী'। নন্দীর সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মিত্রাবরুণ নামক তপস্বীদ্বয় শিলাদের আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁহারা শিলাদের সেবায় তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎবাণী করিলেন যে শিলাদ-তনয় নন্দী অষ্টম বর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মহর্ষি শিলাদ একথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

নন্দী নিজ পিতার দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া মরণকে অতিক্রম করিবার জন্যে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিয়া গেলেন এবং অতি উগ্র তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া জরা ও মৃত্যু রহিত হইলেন। সাধনমার্গে পরিপূর্ণতার পথে এই নন্দীঋষিই ত্রেতাযুগের ভগবৎরামলীলায় 'হনুমান' চরিত্রে ভগবান শ্রীরামদূত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'রামদূত' শব্দে 'রাম' অর্থে আত্মা

আর 'দূত' অর্থে প্রতিনিধি; অর্থাৎ 'আত্মার প্রতিনিধি' যিনি, তিনি পরম বিশ্বাসবান। 'বিশ্বাস' অর্থাৎ বিগত শ্বাস বা শ্বাসশূণ্যতা বা স্থিরপ্রাণ। স্থিরপ্রাণ হইল আত্মা আর বিশ্বাস হইল তাহার মান। অতএব 'হনুমান' হইলেন 'রামদূত', 'রামরূপী' সকল আত্মসত্তার বিশ্বাসরূপী দৃঢ়শক্তির মান। নন্দী ঋষি শিবের প্রধান 'গণ'রূপে পরিগণ্য হইয়াছেন। তিনি বৃষভ রূপে শিববাহন হইয়া ভগবান শিব ও দেবী পার্বতীকে একসঙ্গে আপন স্কন্ধে ধারণ করিয়া বিশ্বপর্য্যটন করেন। তাই শিববাহন বৃষভ 'নন্দীশ্বর' বলিয়া পরিচিত। বৃষভ বা ঋষভ কথাটির অর্থ হইল শ্রেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ। অতএব 'নন্দী' , অতিশক্তিশালী শ্রেষ্ঠ একজন শিবসাযুজ্যবান ব্রহ্মর্ষি যিনি অযোনিসম্ভবা 'হনুমান'রূপে অবতার ধারণ করিয়া দেবী সীতার সংকট মোচন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় 'সংকট মোচন'।

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (২৫) : দাদা প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা নিতেন এবং সেই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দাদা তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের যাচাই করতেন। — কোনও একদিন আমরা সব বসে আছি, দাদা জল চাইলেন পান করবার জন্যে। দাদার ঘরেতে একটি

মাটির জালা বসানো থাকতো এবং জল তোলার জন্যে হ্যাণ্ডেল লাগানো ছোট গেলাস থাকত। সেইটে করে জল তুলে আমরা পাশে রাখা গেলাস ভরতাম। এইভাবে আমাদের কোনো একজন দাদাকে এক গ্লাস জল দিল। দাদা জলটা পান করবার আগে গ্লাসের ভিতরটা দেখতে লাগলেন এবং বেশ গভীর ভাবেই দেখতে লাগলেন। তারপর কোনো একজনকে বললেন যে, ''দেখ তো, গ্লাসের ভিতর কি একটা দেখা যাচ্ছে, যেন কি একটা নড়ছে?'' — যেহেতু বাবা (দাদা) বলেছেন যে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, সুতরাং কিছু দেখা না গেলেও নিশ্চই বাবার দৃষ্টিতে কিছু ধরা পড়েছে? সুতরাং ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দেখে সেই ব্যক্তিটি বললেন, ''হ্যাঁ বাবা, কি যেন একটা নড়ছে।'' তখন বাবা সেই ব্যক্তিটির পাশের জনকে বললেন, ''তুমি দেখো তো কিছু আছে কি না?'' সেও পাশের ব্যক্তিটির মতন বলল, ''হ্যাঁ বাবা, কি যেন একটা আবছা মতন দেখা যাচ্ছে।'' এইভাবে দাদা আরও দু-একজনকে দেখতে বললেন এবং তাদের কাছ থেকে একই উত্তর পেলেন। তারপর আশীষদার পালা যখন এলো তখন তিনি ভালো করে দেখে বললেন, ''দাদা, পরিষ্কার জল। কিছুই নেই। আপনি জলটা পান করুন।'' দাদা তখন স্মিত হেসে বললেন, ''বলছিস্ কিছু নেই, তাহলে দে, জলটা খেয়েনি।''— বলে দাদা জল পান করলেন। তারপর দাদা কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বললেন যে ''সত্যিকারের দৃষ্টি হচ্ছে যোগের পথে যাবার প্রথম সোপান।''

আরেকদিন আশীষদা বাবাকে বললেন, ''দাদা, মাঝে মাঝে চিন্তা হয় যে পরের জন্মে কোথায় কিভাবে জন্মাবো? — গরু, ছাগল, কীট হয়ে জন্মাবো না মানুষ হয়ে আবার এই ধরণীর বুকে আসবো?''— বাবা তখন অদ্ভুতভাবে স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ''তোরা আমার জন্ম-জন্মান্তরের দীক্ষিত সন্তান। পরবর্তী জন্মে তোরা সব সদ্‌বংশে এবং আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন ঘরে ঘর আলো করে আসবি। আমার ক্রিয়ান্বিত সন্তানেরা ঢোঁড়া সাপ নয়, তারা সব রাজ গোখরো সাপ।

প্রসঙ্গ (২৬) : আমাদের দাদা (আশীষদা শ্রীশ্রীবাবাকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন) যেন microfilm এর মতন সমস্ত ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে পান। ঠিক সালটা মনে নেই, সম্ভবতঃ নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের cricket খেলা হচ্ছে, দাদা এবং আমরা ওপরের দোতলার ঘরে বসে খেলা দেখছি। নিউজিল্যাণ্ড খুব মারছে ৪,৬; ভারতের player-রা এপাশ থেকে ওপাশ খালি ছুটছে। আমরা সবাই বলছি, ''দাদা আর দেখতে ভালো লাগছে না; আপনি এখনই out করে দেবার ব্যবস্থা করুন; আমরা হতাশ হয়ে গিয়েছি।'' দাদা হঠাৎ বললেন, ''তোরা কি একটা out দেখতে চাস?'' বলেই দাদা চুপ করে বসে রইলেন। সত্যি! ঠিক পরের বলটাতেই

নিউজিল্যাণ্ড over-boundary বলে catch-out হয়ে গেল! — আমরা আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলাম কেন না ঐ player-টাকে কিছুতেই out করা যাচ্ছিল না। — কিন্তু এখানে একটা কথা আছে যে আপনারা কেউ ভাববেন না যেন শ্রীশ্রীবাবা ঐ out-টা করে দিয়েছেন। এটা কোনো সদ্‌গুরু মহারাজ করবেন না কেন না তাহলে এটা একটা partiality হয়ে যায়। সেই দেশ (নিউজিল্যাণ্ড) কি দোষ করলো যে গুরুমহারাজ নিজের দেশের হয়ে পক্ষপাতিত্ব করে out করে দেবেন? এটা মহাত্মারা কখনোই করেন না; তাহলে মহাত্মনেরা তাঁদের মহান আদর্শ হতে চ্যুত হবেন। এই ঘটনাটির ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীবাবা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে ঐ নির্দিষ্ট বলটাতে নিউজিল্যাণ্ডের player-টি out হয়ে যাবে, ভবিষ্যতে কি ঘটনা ঘটতে চলেছে তা ওনারা দেখতে পান।

মহাত্মারা ত্রিকালদর্শী হন। তাঁরা তাদের প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘটনা অবগত হতে পারেন। মহাত্মাদের এটি বিশেষ প্রকার যোগৈশ্বর্য্য মাত্র। *...ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (২)

ওঁ

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ বাং
কাশীধাম

শ্রীমতী সরলা - পরম কল্যাণীয়াষু,

তুমি বিদেহ-মুক্তি কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। বিদেহ শব্দের অর্থ বিগত দেহ। দেহ থাকিতে যে মুক্তি হয়, দেহ ত্যাগের পর আরোও মুক্তির উৎকর্ষাবস্থা হয়। যাবদ্দেহ থাকে পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত প্রারক কর্মফলের ভোগ হয়। মৃত্যুর পর আর কর্মভোগ থাকে না। উহাই বিদেহ মুক্তি। উহাকেই নির্বাণ মুক্তি বা কৈবল্য মুক্তি বলে। জীব তখন ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে স্থিত হইয়া তাঁহার সহিত একাকার হয়, এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম, আনন্দ ও শান্তি চিরকালের জন্য ভোগ হয়। তাহার আর পূনর্জন্ম হয় না দেহ থাকিতে তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত যে সকল কর্মের ভোগ হয় নাই, তৎসমস্ত আত্মজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইয়া নষ্ট হয়। যেগুলি পূর্বজন্মে প্রস্ফুটিত হইয়া ফলোন্মুখ হইয়াছিল, তাহারা এই জন্মের হেতু হয় এবং সেইগুলি মাত্র কর্মের ফল এই দেহে ভোগ হয়। সেই ভোগের জন্য একটা আয়ুও প্রাপ্ত হয়। প্রারব্ধ শব্দের অর্থ — যাহা ফল দিতে আরম্ভ করিয়া ফল ভোগের জন্য জন্ম ও আয়ু প্রাপ্ত হয়, এবং সেই জীবনে সেই সকল কর্মমাত্রের ফল ভোগ হয়। অন্যান্য কর্মের ফল এই জীবনে ভোগ হয় না। সেই সমস্ত অভুক্ত কর্মের বীজ জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয় না। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভোগ হইয়া তাহার অন্ত হয়। এইরূপে জ্ঞানীর আর কোনো কর্মই থাকে না। তিনি বৈকুণ্ঠধাম, গোলকধাম বা ব্রহ্মলোক ইত্যাদি কোন লোকেই গমন করেন না। সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে দেহমধ্যেই তাহার মন ইন্দ্রিয়াদি বিলীন হইয়া যায়। অগ্রে দ্বৈতভাবে সাধন হয় পরে চিত্ত নির্মল হইলে অদ্বৈত ভাবের বিকাশ হয়। সেই ক্রমিক বিকাশে 'আমি সেই অনন্ত ব্রহ্ম' এইভাবে জ্ঞানের উদয় হয়। ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে সর্বদা সর্বত্র বিনা চেষ্টায় আপনাকে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারেন তখন এই ভাবই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। উহাই জীব-মুক্তি। এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই নির্বাণমুক্তি লাভ হইবে। তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর এবং সদা সাধন কর, জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া যাইবে।

ভগবান কিশোরী মোহন

ইতি —

শ্রীকিশোরী মোহন

('বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

মরুৎগণের কথা

রামায়ণে আছে, ব্রহ্মাপুত্র মরীচি হইতে কশ্যপ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা নাম্নী আটজন কন্যাকে বিবাহ করেন। কশ্যপ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিও ছিলেন। দক্ষকন্যা দিতি ভগ্নী অদিতির মহাতেজশালী পুত্র ইন্দ্রকে দেখিয়া পতি কশ্যপের নিকট ঐরূপ বীর্য্যশালী এক পুত্র প্রার্থনা করেন। পুত্র প্রার্থনা করিলে কশ্যপ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন এবং 'ইন্দ্র শত্রো ভবস্ব' এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন। অতঃপর তিনি দিতির গর্ভধান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ''তুমি শতবৎসর কাল অতীব যত্ন সহকারে সর্বপ্রকার অনাচার বর্জনকরতঃ সম্পূর্ণ শুচিভাবে এই গর্ভকে রক্ষা করিবে। তাহা হইলে তুমি তোমার অভিলষিত পুত্র লাভ করিবে।'' এই কথা বলিয়া কশ্যপ চলিয়া গেলেন।

দিতিও স্বামীর নির্দেশানুসারে শুচিশুদ্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য দিতির নিকট আসিলেন এবং তাহার মনে ছলে-বলে বিশ্বাস জাগাইয়া গর্ভ নষ্ট করিবার সুযোগ লাভের প্রত্যাশায় সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতবৎসর পূর্ণ হইবার তিন দিন যখন বাকি ছিল তখন একদিন দিতি অপ্রমাদবশতঃ অধৌতপায়ে মুক্তকেশে দিবসের কালে নিদ্রিত হইলেন। ইন্দ্র দিতির সেই অশুচিভাব জানিতে পারিয়া সুযোগ পাইয়া তখন দিতির উদরে সূক্ষ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়া সেই গর্ভকে প্রথমে সপ্তখণ্ডে ছেদন করিলেন। কিন্তু বজ্রছিন্ন হইয়াও সেই গর্ভ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে ''মা রুদ'' বলিতে বলিতে সেই প্রতিটি অংশকে পুনঃ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। এইভাবে ঊনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও সেই গর্ভ তখন রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মা পূজার ফলেই যে দিতির ওই গর্ভ বজ্রাহত হইয়াও বিনষ্ট হইল না, তাহা বুঝিতে পারিয়া দিতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, ''মাতঃ! আমি হিংসার বশবর্তী হইয়া আপনার গর্ভ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ করিলাম যে ব্রহ্মার বরে তাঁহারা সর্বথা অবধ্য। ইহাদের রোদন কালে আমি ইহাদিগকে 'মা রুদ' বলিয়াছিলাম। সেইজন্য ইহারা 'মরুৎ' নামে খ্যাত সুখভাগী দেবতা হউক। আমি আপনার এই সন্তানগণকে 'মরুদ্‌গণ' নাম দিয়া দেবগণের সমান করিয়া লইতেছি।'' এই কথা বলিয়া ইন্দ্র মরুদ্‌গণকে নিজ বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। তখন হইতে মরুদ্‌গণ যজ্ঞভাগভোজী হইয়া দেবগণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

ভাগবতে আছে, ইন্দ্র যখন দিতির উদরে প্রবেশকরতঃ গর্ভকে ছিন্ন করিতেছিলেন, তখন ছিন্নমান খণ্ডাংশগুলি এক একটি পূর্ণাঙ্গ বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিতেছিল, ''হে ইন্দ্র, আমরা তোমার ভ্রাতা, তুমি কেন আমাদের বধ করিতে ইচ্ছুক?'' তখন বিস্মিত হইয়া ইন্দ্র প্রকৃত সত্য বুঝিতে পারিলেন এবং উহাদিগকে বলিলেন, ''ভীত হইও না। তোমরা আমার ভ্রাতা, তোমাদিগকে আমি আমার পার্ষদ করিয়া লইব।'' ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা আহত হইয়াও ঊনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত গর্ভ বিনষ্ট হইল না বরঞ্চ প্রত্যেক অংশপূর্ণাঙ্গ বালক হইয়া গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দিতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অগ্নির মত প্রভাসম্পন্ন সেই ঊনপঞ্চাশ জন পিণ্ডকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং কাছেই ইন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া তখন সেই বালকগুলির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র তখন দিতিকে সমগ্র বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দিতি তখন বলিলেন,''আমারই কর্মদোষে আমার গর্ভ বিফল হইয়াছে, তার জন্যে আমি তোমাকে শাপ দিব না, কিন্তু তুমি আমার সন্তানগণের মঙ্গল বিধান কর। আমার পুত্রগণের জন্য নভোমণ্ডলে বাতস্কন্ধ নামক সাতটি স্থান কল্পিত হউক। তাহারা যথাক্রমে আবহ নামক পৃথিবীস্থ প্রথম স্কন্ধ, প্রবহ নামক মেঘ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় স্কন্ধ, উদ্বহ নামক সূর্য্যের ঊর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত তৃতীয় স্কন্ধ, সুবহ নামক চন্দ্র হইতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত চতুর্থ স্কন্ধ, বিবহ নামক গ্রহমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্চম স্কন্ধ; পরাবহ নামক সপ্তর্ষি মণ্ডলাবধি ষষ্ঠ স্কন্ধ; পরিবহ নামক সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্কন্ধে বিচরণ করুক। তোমারই কর্মানুসারে তাঁহারা 'মরুৎ' নামে কথিত হউক।'' ইন্দ্র বলিলেন, ''আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। উপরন্তু আপনার সন্তানেরা দেব সদৃশ হইয়া দেবগণসহ যজ্ঞভাগভোজী হইবে। এই জন্যই মুরৎগণ দিতি পুত্র হইয়াও দেবত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র মরুৎগণকে সাতটি গণে বিভক্ত করেন। বিভিন্ন পুরাণে ঐ সাতটি গণের অন্তর্গত মরুৎগণের নাম ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। এখানে বায়ুপুরাণ মতে মরুৎগণের নাম

দেওয়া হইল, যথা —সত্ত্বজ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি, তির্য্যগজ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিস্মান ও হারিত, ইহারা প্রথম গণের অন্তর্ভুক্ত। ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, সত্যমিত্র, অভিমিত্র ও হরিমিত্র ইহারা দ্বিতীয়গণ। এইভাবে নিম্নলিখিত অন্যান্য মরুৎগণের প্রতি সাতটিতে একটি গণ। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে — কৃত, সত্য, ধ্রুব, ধর্ত্তা, বিধর্ত্তা, বিধারয়, ধ্বান্ত, ধুনি, উগ্র, ভীম, অভিয়ু, সাক্ষিপ, ঈদৃক্ অন্যাদৃক্, যাদৃক্, প্রতিকৃৎ, ঋক্ সমিতি, সংরম্ভ, ঈদৃক্ষ, পুরুষ, অন্যাদৃক্ষ, চেতস, সমিতা, সমিদৃক্ষ, প্রতিদৃক্ষ, মরুতি, সরত, দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদৃক্, সাম, মানুষ ও বিশ।

স্কন্দ পুরাণের নাগখণ্ডে আছে যে দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্র দৈত্যগণকে (দিতি তনয়গণকে) বধ করিলে দিতি শোকাকুলা হইয়া সহস্র বৎসর শক্র-সমুদ্ভব তীর্থে তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন দিতি তাঁহার নিকট দেব-দর্পনাশন, যজ্ঞভাগভোক্তা, বলবান পুত্র প্রার্থনা করেন। মহেশ্বর সেই বরদান করিলে পরে দিতি কশ্যপের ঔরসে পুনঃ গর্ভ ধারণ করেন, যার ফলে 'মরুদ্‌গণ' জন্মগ্রহণ করেন।

যৌগিক ব্যাখ্যা — ''মরিচী'' (ম + ইচি) শব্দের অর্থ (ব্রহ্ম) 'প্রকাশের কিরণ' অথবা 'প্রকাশের কণা' অর্থাৎ ব্রহ্মাণু। 'কশ্যপ' (কশ্য + পা + ক) অর্থাৎ 'কশ্য' অর্থে সুদৃঢ়; যিনি সর্বপ্রকার অবস্থায় দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই 'কশ্যপ' পদবাচ্য। 'অদিতি' (দো + ক্তিন্) অর্থাৎ, পৃথিবী এবং বাণী; অর্থাৎ বাণীরূপা নাদধ্বনি হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। নাদধ্বনি জ্যোতির্ময় শব্দ বিশেষ; অতএব নাদালোক হইতেই সৃষ্টিতে দেবতারা সৃজন হইয়াছেন। তাই 'অদিতি' হইলেন নাদময়ী শক্তির প্রতিমূর্তি। অতএব 'অদিতি' সত্ত্বগুণাত্মক শক্তি। 'দিতি' (দো + ক্তিন্) অর্থে বিভক্ত করা এবং উদারতা বোঝায়। যিনি উদার চিত্তে সৃষ্টি মধ্যে প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রে নিজেকে বিভক্ত করিলেন এবং বিলিয়ে দিলেন, তিনি হইলেন 'দিতি'। অতএব 'দিতি' রজোগুণাত্মক শক্তি। মরুৎ (মৃ + উতি) অর্থাৎ, 'মরুৎ' শব্দের অর্থ বায়ু। বায়ুর দেবতা সমূহকে মরুৎগণ বলে।

'মরিচী'রূপী স্বপ্রকাশব্রহ্মের কিরণ স্বরূপ ব্রহ্ম কণ হইতে বিশুদ্ধ সত্তা সুদৃঢ় আধার সম্পন্ন 'কশ্যপ' উদ্ভুত হইলেন। কশ্যপের প্রথম স্ত্রী বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান পৃথ্বীরূপী আধার সম্পন্ন নাদময়ী শক্তির বাণীরূপা প্রতিমূর্তি 'অদিতি' হইতে দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করিলেন সৃষ্টির বক্ষে। কশ্যপের অন্য স্ত্রী বিশুদ্ধ রজোগুণ প্রধান উদার স্বভাব বিভাজন শক্তি হইতে জন্মগ্রহণ করে দানবগণ এবং দৈত্যগণ আর বিবিধ শ্রেণীর প্রাণী এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বলোকে সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে।

দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ অদিতির পুত্র বীর্য্যশালী ইন্দ্র অর্থাৎ আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ সর্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি এই 'ইন্দ্র'। আর বিদ্যা-অবিদ্যা রূপী দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্ররূপী মন বা চিত্ত আত্মসারূপ্যে অবস্থান করতঃ বিশোকা জ্যোতির প্রজ্ঞার প্রভাবে রজোগুণাত্মক দানব ও দৈত্যসদৃশ রিপুগণকে দমন ও বধ করিলেন এবং স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ রূপে পরিগণ্য ও মান্য হইলেন সারা নিখিল বিশ্বে। ইহাতে দিতিরূপী মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল মায়িক শোকে; অর্থাৎ, দেহাভ্যন্তরে রিপুগণ, ইন্দ্রিয়গণ প্রথমাবস্থায় যখন শমিত ও দমিত হইয়া আসিলে পরে তখন এক উদার হতাশা ভাব চিত্তে উত্থিত হয় এবং প্রজ্ঞালোকের প্রকাশে সেই শোক অপসারিত হইয়া পুনঃ আরও গভীর উপলব্ধির জন্যে তপস্যা করিবার ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয়। তখন সাধক হৃদয়ে শুরু হয় পূর্ণতালাভের জন্যে সচেষ্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তাই ইন্দ্রকেও জয় করিতে হইবে ধ্যান এবং সমাধির মাধ্যমে। উদার মনোভাব লইয়া প্রজ্ঞালোকে তখন সবকিছুর মধ্যেই সাধক নিজেকে ছড়াইয়া দিতে পারেন এবং উপলব্ধি করেন যে প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই সেই আত্মবিন্দুরূপী ব্রহ্মকণের প্রকাশ রহিয়াছে। এ অবস্থা প্রগাঢ় হইলে পরে শিবরূপী আত্মগুরুর কৃপায় তখন মহাদেব দিতিকে বরদান করেন যে দেবদর্প বিনাশন যজ্ঞভাগ ভোক্তা বলবান পুত্র প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম ও মন এই ষষ্ঠ প্রকৃতি জয়ী বলশালী বায়ুরূপী তেজসম্পন্ন মরুৎদেবগণ সমুদ্ভূত হইলেন দিতির গর্ভে। ইন্দ্ররূপী মন উহাকে বধ করিতে চাহিলেও পারিলেন না কারণ উহারা কশ্যপ দ্বারা কৃত যজ্ঞে ব্রহ্মার বরে অবধ্য ছিলেন। অর্থাৎ, ইন্দ্র হইলেন দেবতা কিন্তু প্রাণবায়ু হইল পরাসম্বিতের স্পন্দন মিশ্রিত বায়বীয় আকার বিশেষ যাহা 'দেব' অংশ সম্ভূত; তাই মরুৎগণ দেব হওয়ায় অবধ্য, তাঁহারা ঈশ্বরকোটীর জীব, যেক্ষেত্রে ইন্দ্র দেবতা হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহার গতি জীবকোটীর মধ্যেই আবদ্ধ। অতএব প্রথমে ইন্দ্রদ্বারা সপ্তভাগে ভাগ হইয়া এবং পরে এক একটি অংশে সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া মোট ৪৯ বায়ুরূপে প্রধান ঊনপঞ্চাশ নাড়ী মধ্যে বায়ুশক্তিরূপে প্রবাহিত হন মানব শরীরে; এই প্রকারে ৪৯ নাড়ী উৎসারিত হইল নাভিপদ্ম হইতে এবং সমগ্র দেহের কার্য্যকারিতায় মরুৎগণরূপে বিস্তৃতিলাভ করিলেন।

এই সকল 'মরুৎগণ' হইলেন আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ৪৯ নাড়ী মধ্যে বায়ুরূপী দেবতা বা ঈশ্বর। এই মরুদ্‌গণ হইলেন সুষুম্নার অন্তর্গত নাড়ী সমূহাদি।

ঐ ৪৯ মরুৎগণের আবাস স্থল সপ্ত বাতস্কন্ধে অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের আকাশ মণ্ডলে এই ব্রহ্মাণ্ডের বায়বীয় স্তরে যে গুলিকে 'মরুৎলোক' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই সাত বাতস্কন্ধের প্রথম আবহ, নাভি হইতে নিম্নে পৃথ্বী মণ্ডলের আকাশে অবস্থান করে; অর্থাৎ, নাভি মণ্ডল হইতে কিছু নাড়ী নিম্নে মূলাধার পর্য্যন্ত অবতরিত হইয়াছে এবং পরে স্বাধিষ্ঠান চক্রে যেমন, দ্বিতীয় বাতস্কন্ধ প্রবহ, ভুবর্লোকের বা দ্যুলোক হইতে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানের পুনঃ ঊর্দ্ধে নাভিতে মণিপুরে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত আরোহিত হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। এইখানে বায়ুর যে ক্রীড়া হয় তাহা ব্রহ্মদেবরূপী ব্রহ্মাকে অর্পণ করা হয়। আর মূলাধারে প্রাণ-অপানের প্রাণযজ্ঞ হয়। তৃতীয় বাতস্কন্ধ উদ্বহ সূর্য্য বা তেজ মণ্ডল হইতে আরও ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এইভাবে নাভি হইতে নাড়ী সমূহাদি বিভিন্ন স্তরে গমন করিয়াছে ও চন্দ্রমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাতস্কন্ধ মধ্যে বায়বীয় স্তরে 'মরুৎলোক' উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে যাহা হইল মরুৎদেবগণের আবাসভূমি। অর্থাৎ, নাড়ী সমূহাদি বিশুদ্ধ চক্র অতিক্রম করতঃ আজ্ঞার পথে মস্তকগ্রন্থি বা ললনা চক্রে আসিয়া একত্রে গ্রথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন বিশেষ নাড়ী আজ্ঞা অতিক্রম করিয়া আরও উপরে সহস্রার পর্য্যন্ত আরোহিত হইয়াছে। ললনাচক্রের ৪৯ দল; ঐ ৪৯ দলেই ৪৯ মরুৎগণের কর্মের কেন্দ্র বা দরবার বা সিংহাসন। সেখান থেকেই মনের বিস্তৃতি। ইহারা ললনাচক্র স্থলে সোম মণ্ডল ও সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। কূটস্থে সুষুম্না মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ী রূপী ব্রহ্ম বিন্দুই হইল ধ্রুবপদ বা ধ্রুব নক্ষত্র। অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্বের ব্যাপৃতিতে মনের অন্তিম সীমার পরে চিত্ত মাঝে ধ্রুবপদ পর্য্যন্ত যে সাধক যোগী আপন চেতনাকে বিস্তৃত করিতে সক্ষম তিনি সম্বোধি প্রাপ্ত যোগী হন। ঋক্‌বেদে মরুৎগণের পরিচয় —

এতদ্ভিন্ন ঋক্‌বেদেও মরুৎগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদে মরুদ্‌গণের সংখ্যা সপ্ত। এই সংখ্যা উল্লেখের সময় সপ্তমে সপ্ত অর্থাৎ সাত-সাত জন মরুতের উল্লেখ থাকায় পুরাণে ৪৯ জন মরুৎ হইয়াছেন। আবার ঋক্‌বেদের একস্থলে ৬৩ জন মরুতের উল্লেখও রহিয়াছে। মরুৎগণ ঋক্‌বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা। তাঁহারা ৩৩ টি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। অন্য দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি ও পূষার সঙ্গে আরো ৯টি সূক্তে এঁদের স্তুতি আছে। মরুদ্‌গণের পিতা মাতা রুদ্র ও পৃশ্নি (সম্ভবতঃ বিচিত্রবর্ণ মেঘ)। পৃথিবী ও সমুদ্রের এবং রুদ্রের পুত্র বলে এঁরা 'রুদ্র' নামে অভিহিত হইয়াছেন। এঁরা সকলেই সমবয়সী এবং এঁরা দেবী রোদসীকে (রোদসী অর্থে আকাশ, বিদ্যুৎ) বিদুন্ময় রথে বহন করেন। রোদসী মরুদ্‌গণের স্ত্রী। মরুদ্‌গণ ইন্দ্র পত্নী ইন্দ্রাণীর সহায়ক ও বন্ধু এবং সরস্বতীর সখা। এঁরা বসুগণের সহিত এক রথে ভ্রমণ করেন।

মরুদ্‌গণের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়, বিদ্যুৎ বিজড়িত দেহ। এঁদের পিতা রুদ্রের মত এঁদের হস্তে কুঠার ও ধনুর্বাণ রহিয়াছে। এঁরা বৃষভের মত গর্জন করায় পৃথিবী কম্পিত হয়, বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, বন বিমর্দিত হয়। মরুৎগণের প্রধান কাজ সূর্য্যের চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখা। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সখা ও অনুচর। ইঁহারা সঙ্গীত ও স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করেন। ইন্দ্র তাঁহার সকল কার্য্য এই মরুদ্‌গণের সাহায্যেই করিয়া থাকেন। (*বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে সংগৃহীত*)

—(*যৌগিক ব্যাখ্যা*) **শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**

কৃষ্ণ কথা

মুরু বধ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

'মুরু' নামে এক ভীষণ রাক্ষস ছিল। ইহার সাত হাজার পুত্র ছিল। প্রাক্‌জ্যোতিষের রাক্ষস রাজ 'নরক' ইহার মিত্র ছিল। এই নরক রাক্ষস তাহার বন্ধু মুরুর রাজধানী শ্রীকৃষ্ণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে মুরুকে সাহায্য করিয়াছিল। নরক তাহার এই রাক্ষস সহচরের চারিদিকের সীমা তরোয়ালের মত তীক্ষ্ণ দড়ি দিয়া জড়াইয়া রাখে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আক্রমণ করিলে চক্র দ্বারা সমস্তই টুকরো টুকরো করিয়া কাটিয়া ফেলেন এবং মুরুর সাত হাজার পুত্রকে পতঙ্গের মত অগ্নিতে দগ্ধ করেন। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ মুরুকেও বধ করেন। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম 'মুরারি'। মুরু রাক্ষস পঞ্চমস্তক বিশিষ্ট ছিলেন।

(*ভাগবত পুরাণ হইতে সংগৃহীত*)

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীসর্বাণীমাকে বিশেষ অনুরোধ, উনি যদি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর আলোকপাত ও ব্যাখ্যা 'হিরণ্যগর্ভ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন তা হলে একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। পরে তা পুস্তকে রূপ দেওয়া যেতে পারে। **—বিজন কুমার সেনগুপ্ত**

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে:—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

১। পত্র (২) - ''শ্রীশ্রীগুরুদেব আপনাকে (শ্রীঅক্ষয় দত্তগুপ্তকে) কিছু যোগসিদ্ধির পথে কার্য্য দিবেন।'' এই যোগসিদ্ধির পথ কি?

উত্তর — আত্মজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধি প্রত্যক্ষভাবে করিতে হইলে সহস্রার উপরি ব্যোম মণ্ডলে যে ভর্গজ্যোতিরূপ সৌরমণ্ডল রহিয়াছে, সেই সৌর-মণ্ডলের আশ্রয় গ্রহণ অর্থাৎ সৌরতত্ত্বের জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া করিতে হইবে। সহস্রার উপরিভাগে পরমব্যোমস্থিত সৌরমণ্ডল হইতে যে সকল রশ্মি অবতরণ করতঃ দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ীজাল সৃজন করিয়াছে এবং সহস্রারে অক্ষরবিন্দু সমন্বয়ে গ্রথিত সূর্য্যরশ্মি নিম্নে বিভিন্ন স্তর অবলম্বন করিয়া, বিভিন্ন স্তরের চক্রমধ্যে গ্রথিত হইয়াছে অক্ষর বিন্দু সমন্বয়ে — এইরূপ সৌররশ্মি সমন্বিত নাড়ী জ্ঞানকেই যোগসিদ্ধির পথ বলা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন হৃদয় প্রদেশ এবং নাভি এবং ঊননাভি স্থল — এই কয়টি সৌর রশ্মি সমন্বিত নাড়ী চেতনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল, যা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহকে সঞ্চালিত করে।

'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ 'বিশিষ্ট জ্ঞান'। সৃষ্টির বক্ষে চৈতন্যের দুই রূপ প্রকাশ —যথা— জড় ও চেতন। উভয়ই বিজ্ঞানের বিষয়। সূর্য্যরূপী প্রাণ ইহার কেন্দ্রস্বরূপ প্রধান আশ্রয়, তাই ইহাকে সূর্য্য-বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি, কি প্রকারে বা উপায়ে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা যিনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন, তাহাকে 'যোগবিদ্' বলা হয়। যিনি এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান রূপ যোগ সাধনা করেন তিনি জানেন যে সূর্য্যই সকল প্রকার বিজ্ঞানের মূল স্তম্ভ। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার — সবই সূর্য্যাধীন। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রসার সৌরমণ্ডল হইতেই হইতেছে। শুধু তাহাই নহে দেহাভ্যন্তরস্থ সকল নাড়ীগুলির মধ্যে বায়ুরূপী প্রাণ প্রবাহের জন্যে ঐ সৌরশক্তিই কারণ। দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন নাড়ীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রাণবায়ুর ক্রীড়া ও কার্য্য-কারিতা যেমন যেমন হয়, বিশেষ কৌশলে প্রাণায়ামের ফলে সেই সকল নাড়ীগুলির শুদ্ধিকরণের ফলে তখন বিভিন্ন প্রকার যোগসিদ্ধিরূপী বিভূতির প্রকাশ হয় যোগী-সত্তায়। এই সকল যোগসিদ্ধির পথে চলিতে হইলে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাণসাধনারূপী ব্রহ্মবিদ্যার কৌশল, যা সদ্‌গুরু বক্ত্রগম্য, সাধন করিতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যার কৌশল সাধনাই হইল যোগসিদ্ধি পথের কার্য্য। আর 'যোগসিদ্ধির পথ' হইল ব্রহ্মবিদ্যার কৌশল সাধন; ব্রহ্মবিদ্যা প্রাণবিদ্যা চিন্ময় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তত্ত্ব সাধন - যা হলো সৌর বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন - ''সূর্য্য বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে অন্যান্য বিজ্ঞান - যাহা উহারই অঙ্গমাত্র - সহজেই আয়ত্ত হয়। যোগশাস্ত্রে সর্বজ্ঞাতৃত্ব এবং সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব নামক বিশিষ্ট সিদ্ধি যেমন যাবতীয় খণ্ড সিদ্ধির চরম উৎকর্ষ, বিজ্ঞান রাজ্যে সৌর বিজ্ঞানেরও তদ্রূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। চন্দ্র বিজ্ঞান, নক্ষত্র বিজ্ঞান, বায়ু বিজ্ঞান, স্বর বিজ্ঞান, দেব বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই সৌর বিজ্ঞানের অন্তর্গত খণ্ড বিজ্ঞান বিশেষ।'' — এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে নাড়ী বিজ্ঞান সমন্বয়ে আত্মজ্ঞানরূপী যোগ ও বিজ্ঞান হলো একটি অখণ্ড মহাবিজ্ঞানের পর্য্যায় অখণ্ড জ্ঞান সম্বলিত যোগসিদ্ধির পরম পথ। যোগের গতিপথে ১০৮ প্রকার পর্য্যায় আছে জ্ঞানপীঠের যোগ সাধনায়।

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

একবিংশ পর্য্যায়—

ব্রহ্মোবাচ —

শ্লোক :— *ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা,*
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।।৫২
অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরাঃ।।৫৩

শব্দার্থ :— স্বাহা - যজ্ঞে আহুতিদান মন্ত্র; স্বধা - পিতৃদান মন্ত্র; বষট্‌কার - পূজা হোম জপ ইত্যাদি দেবকার্য্য এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃকার্য্যে ব্যবহৃত মন্ত্র; স্বরাত্মিকা - উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামক স্বর রূপিণী; ত্রিধামাত্রাত্মিকা - তিন মাত্রা বিশিষ্টা; অর্দ্ধমাত্রা - তুরীয়া বা নির্গুণা রূপে; অনুচ্চার্য্যা - যা উচ্চারণ করা যায় না; জননীপরা - পরম বিশুদ্ধা (পরা) জননী।

বাংলা শ্লোকার্থ :— ব্রহ্মা স্তব করছেন, ''হে মা! তুমি স্বাহা (যজ্ঞে দেবগণকে ঘৃতাহুতির মন্ত্র), তুমি স্বধা (পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানের মন্ত্র), এবং তুমিই বষট্‌কার (দেবগণের আবাহনের মন্ত্র) স্বরূপা। তুমিই স্বরাত্মিকা স্বরূপা অমৃতরূপা এবং ত্রিমাত্রা স্বরূপে (অ-উ-ম) অবস্থিতা প্রণবরূপা। অর্দ্ধমাত্রা রূপে তুমি নিত্যা নির্গুণা।''

যৌগিক ব্যাখ্যা :— সাধকের ব্রহ্মারূপী মন আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে মধু কৈটভ অসুরদ্বয়কে বিনাশ করার জন্য মহামায়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে স্তব স্তুতি করে, তার মধ্যে আদ্যাশক্তির গৌরবময় পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কারাদি মন্ত্রের উচ্চারণে যে পূজা, দান, আবাহন, ব্রত সম্পন্ন হয়, তাতে জগদম্বার মহিমা পরিস্ফুট হয়। সেই সঙ্গে এই সমস্ত কর্ম সম্পাদনের ফলস্বরূপ যে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তার মধ্যে অমৃতময়ী মায়ের করুণা নিহিত । আবার সকল মন্ত্রের উৎস স্বরূপ যে ওঙ্কার, যা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে জগতে বিদিত, সেই তিন মাত্রার মধ্যেও মহামায়ার আদি চৈতন্য শক্তি বিরাজিত। মা! তুমি অর্দ্ধমাত্রা (মা স্বরার্ধ মাত্রা স্বরূপিণী নির্গুণা তাই তাঁকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না); স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে যা প্রকাশ করা যায় না সেই ব্যঞ্জনবর্ণ তুমিই। স্বরবর্ণের সহায়তায় ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। যোগীর ভাবনায় এইভাবে স্বর অর্থাৎ নাদরূপ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পান। ওঙ্কারের মস্তকে এই অর্দ্ধমাত্রারূপী চন্দ্র-বিন্দু, নাদ ও বিন্দু রূপে প্রকাশিত। তোমার অবস্থিতি আছে, বিস্তৃতি নাই — বিন্দু স্বরূপা। তুমি সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী স্বরূপা। ত্রিমাত্রারূপে তুমি একদিকে জগৎ জননী, অর্দ্ধমাত্রারূপে তুমিই পরাজননী, তুমিই সর্বোত্তমা শক্তিরূপে দেবগণের আদি জননী।

বাস্তবে তাই প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ জনিত এই ত্রয়ী শক্তির মধ্যে দেবী মহামায়ার অদ্বৈত সত্তা স্বরূপ পরমাত্মরূপী চৈতন্যের নিত্য প্রবাহ কাজ করে চলেছে তা প্রকৃত যোগীকে অনুধাবন করতে হবে।

শ্লোক :— *ত্বয়ৈব ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।*
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।।৫৪

শব্দার্থ :— ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে - তুমি ইহা সৃষ্টি কর, ত্বমৎস্যন্তে - তুমি অন্তে বা প্রলয়কালে ভক্ষণ কর।

বাংলা শ্লোকার্থ :— হে দেবী! তুমিই এ জগৎ ধারণ করে রেখেছো। তুমিই ইহাকে সৃষ্টি করেছো। তুমি ইহাকে পালন করছো এবং প্রলয়কালে সর্বদাই তুমি ইহা বিনাশ করছো।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— মা! তুমিই বীজরূপে বিশ্বকে গর্ভে ধারণ, প্রসব এবং প্রতিপালন করে প্রলয় কালে লয় করছো। যোগীর মন আধ্যাত্ম চেতনায় অনুধাবন করে, সগুণ ব্রহ্মই এই জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার ক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর নিত্য লীলাময়ী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের চক্রবৎ আবর্তন ক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তান স্নেহে জীবকে উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ করে তাকে দেবত্বে উন্নীত করে আপন সত্ত্বায় সংলীন করেন। ইহাই জগৎজননী মহামায়ার চিরন্তন দিব্যলীলা। *.....ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২৭)

নরেন - ''অনেক দিন হল আপনার মুখ থেকে মহাবিদ্যাদের কথা শুনিনি, দ্বিতীয় মহাবিদ্যা মা তারার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি, আজ যদি সুবিধা হয় তৃতীয় মহাবিদ্যার কথা কিছু বলুন''—

রামকৃষ্ণদেব হাসি মুখে উত্তর দিলেন—''এখনও একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ শিখলি না একেবারে তিন-এ নেত্রর কথা শিখবি? প্রথম মহাবিদ্যা কালীমাতার কথা না শুনে, মাথার কালি পায়ে গেলে যে শিব হয়ে যায়, তাও বুঝলি না, একেবারে গীতার কথা? মা চণ্ডীর কথা ফেলে দিয়ে একেবারে কৃষ্ণের কথা শোনা! কলিযুগে কালীর কথা বাদ দিয়ে কি কল্‌কি অবতারের কথা বলা যায়?''

নরেন —''আমার মুখ থেকে ওঁরই কথা এলো তাই বলে দিলুম—এবারে গুরু ইচ্ছা, তাঁর মুখ থেকে যা কথা বেরোয় তাই শুনবো। তবে মা চণ্ডীর কথা বা কালীমায়ের কথা শুনতে বা তাঁদের দর্শন করতে ভয় হয়, সেই জন্যই হয়তো কঠিন ছেড়ে কোমলে আসতে ইচ্ছা করছে। যদিও বুঝি — 'জানি আমার কঠিন হৃদয়; চরণ দেবার যোগ্য সে নয়'।''

রামকৃষ্ণদেব —''নরেন তোর, কথাগুলো বেশ মিষ্টি, অমনি মায়ের কথা, মা ভবতারিণী আর মা তারার কথাও অমনি মধুর। মায়ের বাইরের রূপ দেখে বোধহয় ভয় পাস্ মন্দিরের গাঁথা পাথরগুলোই দেখেছিস্, মায়ের ছবি বোধহয় দেখিস্‌নি, মায়ের হাতের খাঁড়া দিয়ে যে বাঁশী বাজে, আর চরণ নূপূরে যে আলোর রাশি গোপীকুল হয়ে নাচে—সে সব তোর তো জানা নেই, আর দেখাও নেই—তাই লাগে তোর ভয়—ওসব ভাবলে কি মায়ের দেখা হয়? আজ রাত্রে পারিস্ তো একবার আসিস্, মাকে বলে যদি তোর কানের মাঝে বাঁশীর ধ্বনি দিতে পারি।''

নরেন —''স্বপ্নের মাঝে কখনো কখনো আপনার রূপ দেখতে পাই। একদিন দেখি আপনিই আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে মা কালী হয়ে হাসছেন, তাতে আমার ভয়ও হয় আবার আনন্দও আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে এত চোখের জল পড়ে যে সারা রাত্রিই কেটে যায়—ভোরবেলাতে ভাবি, এত চোখের জল কোথা হতে আসে?''

রামকৃষ্ণদেব —''সব মানুষই এক একটি জলের কুঁজো জানবি, চোখ দুটো তার রাস্তা। খাবার জল যেমন কলসীতে থাকে দেবতার উদ্দেশ্যে যে সব জল দরকার, সে সব চোখের মধ্যে থাকে। মা ভবতারিণী তাই বলেন। 'যে দিন এলো চোখের জল; সেদিন পূজায় নবদূর্ব্বাশ্যামের দল'—চোখের জলে যাদের পূজা হয় সেদিন তাদের অঙ্গে আলোর রাশি নৃত্য করে চলে।

পুজোর কথা বলতে গিয়ে মায়ের কথা ভুলে গেলি? গঙ্গাজলে নেমে মা গঙ্গার পুজোই হল না? মা-ই সব ভুল করিয়ে দেন জানিস্?

কালীপুজোর একটি রাতের কথা শোন্—একদিন আরতি পূজার পর মা বললেন, 'আজ তোকে কলাবৌ সাজতে হবে—কলাবৌ সেজে লাল পেড়ে শাড়ী পরে তুই গঙ্গাস্নানে যাবি, গঙ্গাস্নানে যাবার সময় শুধু তোর পায়ের দিকে নজর রাখবি।' মা চলে গেলেন—রাত্রি ১১টা বেজে গেল—নিঝুম রাত্রি, মন্দিরে ঢুকে ভাবছি লাল পেড়ে শাড়ী কোথায় পাব? কলসীটা হাতে নিয়ে নিজের ধুতিটাকেই রাঙ্গাজবা দিয়ে রাঙ্গা পাড় করে নিয়ে বেরোতেই দেখি একটি কালো মেয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে—'এই নাও তোমর শাড়ী—মা পাঠিয়েছেন'।''

...ক্রমশঃ

অখণ্ড মহাসত্তা হইতে খণ্ড খণ্ড জ্যোতির্বিন্দুসম অজস্র স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া সৃষ্টির বুকে মহাকাশ মণ্ডলে পড়িতে থাকে। সেই এক একটি জ্যোতির্বিন্দুই 'অণুপরমানু' যাহা শুদ্ধ সৎ। ইহার পর সৎ + অণুপরমানু দল মহাচৈতন্য সাগরের বুকে ক্রমশঃ চিৎযুক্ত হইয়া হয় 'চিদণু'। সেই চিদণু দল চৈতন্য সাগরে তরঙ্গায়িত লহরের মধ্যে অবগাহন করাকালীন আনন্দসত্তায় সংযুক্ত হয়। ইহার পরই সৃষ্টি হয় সচ্চিদানন্দ আনন্দময় আত্মসত্তা। এই অবস্থায় ভাব ও অভাবের বোধদয় ঘটে। তারপর সেই আত্মসত্তা মহাইচ্ছার কারণে বিষ্ণুনাভিতে পতিত হইয়া সৃষ্টির গণ্ডীতে মহাকালের ক্রমচক্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই অবস্থায় আত্মসত্তা মাঝে সত্ত্ব-রজ-তম এই তিনগুণের বিকাশের ফলে দৃশ্যমান স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ সত্তার চিদাকাশে প্রতিফলিত হয়। চিদণুরাজি খণ্ড বিখণ্ডিত আকার ধারণপূর্বক সৃষ্টিমধ্যে জড় ও চেতনরূপ অনন্ত পদার্থ সৃজনকারী, যাহাদের মূল উপাদান হইল পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। 'তারা' হইল খণ্ডকালশক্তিস্বরূপিণী বা শক্তি পরমাণু সদৃশ চিদণু, যাহা হইতে নিখিল রূপময় বিশ্বের জন্ম হইয়াছে পরবর্তী সৃষ্টিধারাগুলিতে।

— (শ্রীশ্রীমা সর্বাণী রচিত 'অধ্যাত্ম' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৩১ : 'দীক্ষা' কথার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর : বিশ্বসার তন্ত্রে আছে —

"দিব্যজ্ঞানং যতো দদাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং ততঃ।
তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা সর্ব্ব তন্ত্রস্য সম্মতা।।" —

অর্থাৎ, যাহা দিব্যজ্ঞান প্রদান এবং পাপ নষ্ট করে তাহাকে ব্রহ্মতন্ত্রবিদ্‌গণ দীক্ষা বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। আর বেদান্ত বলেছেন, *"আচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা সগতিং ব্যনক্তি।"* — অর্থাৎ আচার্য্যরূপে বা সদ্‌গুরুরূপে ভগবান নিজ গতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সর্বান্তর্য্যামী ভগবান আচার্য্যের চিত্তে অবস্থান করে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পূর্বক শিষ্যের মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন।

'দীক্ষা' শব্দের অন্য অর্থ ঈক্ষণ বা দর্শন দান করা; এক্ষেত্রে দর্শন অর্থে ব্রহ্মচৈতন্যের সগুণ প্রকাশ বা জ্যোতি দর্শনের কথাই বলা হয়েছে, যে জ্যোতি দর্শনের ফলে সাধকের কূটস্থরূপী বিশ্বযোনিতে বিশ্বের রূপ প্রকটিত হয়।

প্রশ্ন ৩২ : যোগীর পরিচয় কি? যোগ সাধনা করিয়া কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে 'যোগ' সম্যক সিদ্ধ হইয়াছে? সাধারণ লোক যোগীকে চিনিবে কি করিয়া?

উত্তর : প্রকৃত যোগী সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হন। যিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন তিনিই যোগী। একজন বিরাট সূফী মহাত্মাকে (আবদুল কাদির জিলানীকে) বলা হইয়াছিল —"জলের মধ্যে অগ্নি সংযোগ করুন তো।" তিনি জলের ভিতর আগুন জ্বালাইয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। যোগীর নিকটে কিছুই অসম্ভব থাকিতে পারে না। যোগী মানুষ হন না যোগী ঈশ্বর হন; কারণ সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা ঈশ্বরের ধর্ম, মানুষের ধর্ম নহে। অসম্ভবকে সম্ভব করাও মায়ার ব্যাপার; মায়া ঈশ্বরেরই অধীন শক্তি বিশেষ।

ঈশ্বরত্ব মানেই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ; তা না হইলে মনুষ্য কদাপি যোগী পদবাচ্য হইতে পারেন না। ঈশ্বরই যোগী আর যোগীই ঈশ্বর। আত্মার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে বলিয়া চিত্ত দর্পণে কামনা-বাসনার নিরন্তর তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। যোগবলে কূটস্থ মধ্যে হিরন্ময় পুরুষের আবির্ভাব হইলে অজ্ঞান অপসারিত হইয়া যায়। অজ্ঞান অপসারিত হইয়া গেলে প্রজ্ঞার আলোকে যা দর্শন হয় তা নিত্য ও ধ্রুব সত্য। যোগবলে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে তখন আত্মার নিতৈশ্বর্য্যের বিকাশ হয়; সেটিকেই যোগৈশ্বর্য্য বলা হয়।

মহাত্মনের সান্নিধ্যে সৎসঙ্গের মাধ্যমে যোগীর যোগীজনচিত স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া সাধারণে যোগীকে চিনিতে পারে। যোগীগণ সর্বদা তাঁহাদের স্বমহিমায় বিরাজ করেন। সচরাচর তাঁহাদের যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন না; শুদ্ধাভক্ত বা ভক্তের নিকট অনেক সময়ে তাঁহাদের যোগৈশ্বর্য্য সহজ সরল ভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যোগীগণ অনুভবগম্য শ্রদ্ধার পাত্র। যোগীরা সিদ্ধাই নন। ছোট-খাট ভৌতিক সিদ্ধিকে যোগৈশ্বর্য্য বলে না। যোগীগণ ব্রহ্মস্বরূপ হন। যিনি যোগী তিনি ব্রহ্মবিদ্; তাই শাস্ত্রে বলিয়াছে — "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" — অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান।

প্রশ্ন ৩৩ : ক্রিয়া করার ঝোঁক বা ইচ্ছা জাগানো যায় কি ভাবে?

উত্তর : নিজ অন্তরে সৎচিন্তার দ্বারা নিজেই নিজেকে যাতে অনুপ্রাণিত করতে পারো সেরকম নেশা ধরাতে হবে। সংসারে মায়াবদ্ধ জীব মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে। সামনে যা দেখতে পায় না, তারা সেই বস্তু লাভের চেষ্টাও করে না। সংসারের জাগতিক কর্মবন্ধনে ঘাতপ্রতিঘাতে সংঘর্ষের ফলে প্রারব্ধ অনুযায়ী সুখ-দুঃখকে ভোগ করতে করতে একদিন অবশ্যই মানসিক ক্লান্তি আসে। তখন সদ্‌গুরুর কাছে বা কোনো মহাত্মার সান্নিধ্যে গিয়ে সেই ক্লান্তিকে বিদূরিত করে তারা। সৎসঙ্গে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায় কারণ প্রকৃত সদ্‌গুরু যিনি, তিনি তাঁর অখণ্ড জ্যোতির প্রভায় অলক্ষ্যেই জীবের মলিনতা কলুষতা ধৌত করে দেন। তাই প্রকৃত সদ্‌গুরু সান্নিধ্যে বা সুউন্নত মহাত্মা বা সিদ্ধপুরুষের সান্নিধ্যে মানুষের মনের চিত্ত তরঙ্গের অণুপরমাণু পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন অন্তরে আপনা হতেই প্রেরণা জাগে এবং সাধন করার জন্যে মনের উদ্দাম বাড়ে। তবে এও অস্থায়ী ব্যাপার । ঐ ব্যাপারটিকে স্থায়ী করতে হলে নিয়ম করে গুরু-সান্নিধ্যে সৎসঙ্গ করতে হবে। ঈশ্বর ভাবনা থেকে ঈশ্বর দর্শন ও অনুভূতি হয়। ভাবনার তারতম্যে অনুভূতি উপলব্ধিরও তারতম্য হয়; সেই থেকেই ক্রিয়াযোগরূপ ব্রহ্মবিদ্যা সাধনের ঝোঁক বা ইচ্ছা জাগে। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে তমোগুণ আর রজোগুণ, এদুটিকে প্রশ্রয় দিলে সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(১)

শিবরামপুরের অখণ্ড মহাপীঠের পশ্চিমদিকে চারিধারে রাস্তা দ্বারা বেষ্টিত, মাঝখানে সর্বসাকুল্যে মোট ৮ (আট) কাঠা জায়গার উপর এখন রয়েছে, দক্ষিণে ভক্তনিবাস এবং উত্তরে অন্নপূর্ণা ক্ষেত্র। এ সবই ছিল আমাদের গুরুমাতা শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ব পরিকল্পিত মনোবাসনা। অবতারকল্প দেব-দেবীদের মনের ইচ্ছা আমাদের মতন সাধারণের নিকট বোধগম্য হওয়া বড়ই মুশকিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না, তাঁর মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে সেই দৈবী বাসনার কথাগুলি। তাঁর নির্দেশ মতন ইং ২০০৯ সালে এটি তৈরীর যে কাজ শুরু করা হয় তা আজ অবধি চলমান, তবে এই কাজের গতি প্রায় শেষের দিকে। ইং ২০১১ সালে ট্রাষ্টের মিটিং-এ শ্রীশ্রীমা সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইং ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে উদ্বোধন হবে অন্নপূর্ণাক্ষেত্র। এছাড়া শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মায়ের বিগ্রহের ঘরের উপরের ঘরে স্থাপিত হবে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউর শ্রীবিগ্রহ।

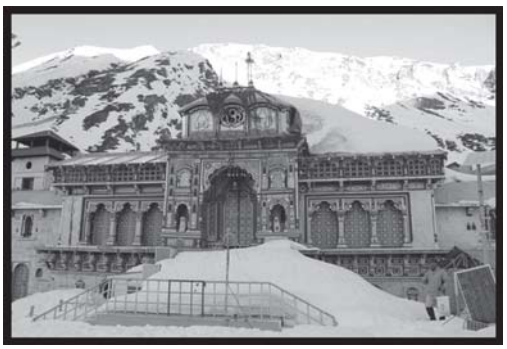

তুষারাবৃত শ্রীশ্রীবদ্রীনাথ ধাম

শ্রীশ্রীমা আমাদের বলেছিলেন যে স্থায়ীভাবে ভগবান শ্রীনারায়ণের অধিবাসের জন্য সদা জাগ্রত পীঠস্থানে গিয়ে শ্রীনারায়ণদেবকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসার বিশেষ প্রচলন আছে এবং এটাই শাস্ত্রীয় নিয়ম। তারজন্য প্রয়োজন বিগ্রহের নিকট রাখার প্রথা অনুযায়ী শালগ্রাম - শিলাগুলিকে নিয়ে শ্রীনারায়ণক্ষেত্রে অর্থাৎ দুর্গমগিরি হিমালয়ের কোলে প্রাচীন দেবভূমি শ্রীবদ্রীনাথধামে গিয়ে পূজা দিয়ে আসার। সেইজন্য শ্রীশ্রীমা সকল রকমের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সময় যতই এগিয়ে আসতে থাকে প্রস্তুতিপর্বও ততই দ্রুত পথে অগ্রসর হয়ে চলে।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমি, সেই মহাপুণ্য তীর্থে যাবার ইচ্ছা জানালে তিনি মত দেন এবং শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে আমরা মোট পাঁচ জন তীর্থযাত্রী রওনা দিয়েছিলাম। আমরা দুইজন সন্ন্যাসী, আমি ও স্বামী প্রবোধানন্দজী, একজন ব্রহ্মচারী ডাঃ বরুণ দত্ত এবং একজন সংসারী ডঃ পার্থ প্রতীম চক্রবর্ত্তী, যার স্ত্রীর যাবার কথা আমাদের সাথে থাকলেও অসুস্থতার কারণে উপস্থিত মূহুর্তে টিকিট বাতিল করতে হয়েছিল। অনেকটা পথ, তাই কিছুটা সময় লাঘব করার উদ্দেশ্যে এবং গুরুমার কিছু বিশ্রামের কথা চিন্তা ও আরামদায়ক যাত্রার কথা মাথায় নিয়ে আমরা কোলকাতা হতে দিল্লী, বিমানে করে রওনা হয়েছিলাম ইং ১৭ই সেপ্টম্বর ২০১২ সোমবার, বিশ্বকর্মা পূজার দিন। দিল্লী থেকে গুরগাঁও, সেখানে আমাদের গুরুভাই নেহাল ও বুবাইদের বাড়ীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তাদের আপ্যায়িত সেবা গ্রহণ ও তাদের দুষ্টু-মিষ্টি পুতুল কন্যা দিয়াকে আদর করে সেখান থেকে গাড়ী করে সোজা রওনা দিয়েছিলাম শিবালয় ও হিমালয়ের প্রবেশদ্বার হরিদ্বারের পথে। নূতন পথের যাত্রাকে কেন্দ্র করে ছিল বেশ কিছু নূতন আনন্দ। সদ্‌গুরুর (শ্রীশ্রীমায়ের) সঙ্গ করে তীর্থভ্রমণে হরিদ্বার ও হৃষীকেশ যাওয়া ভাগ্যে হয়ে থাকলেও, গাড়ী করে এই পথে পূর্বে কোনদিন যাওয়া হয়নি। তাই চলন্ত গাড়ীর কাঁচের দিকে গোলগোল চোখ করে চেয়ে, বাইরের প্রকৃতির ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য্যের অপরূপতা মনের কোটরে ধরে রাখার চেষ্টা করতে থাকি। গাড়ীতে শ্রীশ্রীমা ও গুরুভাইদের কথার মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরণের রসিকতা, তার মাঝে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ ও গল্পের মাধ্যমে হিমালয়ের দেবভূমি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিছুকথা এই তীর্থযাত্রা পথে জানতে পেয়েছিলাম শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হতে। এই তীর্থযাত্রা পথে আমাদের গাড়ীতে অভিভাবক হয়ে চলেছিলেন সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমা এবং মায়ের কোলে উপবিষ্ট হয়ে দেবভূমির দুইজন দেবতা, যথা - শ্রীদামোদর নারায়ণ শিলা ও শ্রীধর নারায়ণ শিলা। তাই গাড়ী পথে আমরা চলেছিলাম ঁমা আদ্যাশক্তির তরুছায়ায় মহা আনন্দে ও নিরাপদে।

দিল্লীতে আসার জন্য বিমানের টিকিট কাটার পরেই হরিদ্বারের বাসিন্দা আমাদের গুরুভাই সচ্চিদানন্দজীকে বদ্রীনাথধামে শ্রীশ্রীমায়ের তীর্থযাত্রার সংবাদ জানানো হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে বলা হয়েছিল হরিদ্বারে রাত্রিবাসের জন্য ভাল ও নিরাপদ হোটেল এবং সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে যেন খাবারের ব্যবস্থা থাকে। পরদিন হরিদ্বারে ও হৃষীকেশে পরিচিত কয়েকটি আশ্রমে শ্রীশ্রীমা যাবেন আমাদের নিয়ে এবং তারপর দিন অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টম্বর ২০১২ তারিখে সকালবেলায় গাড়ী করে তিনি (শ্রীশ্রীমা) রওনা দেবেন শ্রীবদ্রীনাথধামের উদ্দেশ্যে। এই সকল

ব্যবস্থা যেন সচ্চিদানন্দজী আগে থেকেই করে রাখেন এবং বদ্রীনাথধামেও যেন রাত্রিবাসের জন্য ভালো হোটেলের ব্যবস্থা করে রাখেন। দায়িত্বপূর্ণ আমাদের গুরুভাই সচ্চিদানন্দজী ও তাঁর স্ত্রী গীতা ভাবী দুজনে এক এক করে সকল ব্যবস্থা করে রেখে আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এইসবের চিন্তা মোটেই ছিল না আমাদের মাথায়, কেবলমাত্র শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণকে কেন্দ্র করে মনে দানা বেঁধেছিল সেই পরম পবিত্র তীর্থস্থানের অবস্থান, মৌন মহিমাযুক্ত ধ্যান গম্ভীর পর্বতমালা হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কারিগরি, তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গের অপূর্বতা, পার্বত্য উপত্যকায় স্বর্গ হতে প্রবাহিত হয়ে আসা পুণ্যতোয়া নদীগুলির মিলনস্থল এবং তাদের বিভিন্ন স্থানের গতিবেগের উপর সৃষ্টি হওয়া অপরূপ দৃশ্যগুলি দেখার আকাঙ্ক্ষা। এর কারণ, শ্রীশ্রীমায়ের সাথে ভ্রমণ সঙ্গী হয়ে আমরাও কয়েকজন ছিলাম একেবারেই নূতন তীর্থযাত্রী।

সেই পরম পবিত্র স্থান সম্বন্ধে ধর্মগ্রন্থ হতে জানতে পারি যে, অক্ষয়ধাম ও মোক্ষধাম বলে পরিচিত সকল ধর্মপ্রাণ তীর্থ যাত্রীদের নিকট হিমালয়ের অতি পুণ্যতম আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় তীর্থস্থান হল বদ্রীনাথধাম। এই তীর্থস্থানটি উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গাড়োয়াল জেলায় দুর্গমগিরি হিমালয়ের কোলে, নীলকণ্ঠ পাহাড়ের পূর্বদিকে, নারায়ণ পর্বতের পাদদেশে, প্রবাহিত পুণ্যসলিলা স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। অপরূপ সৌন্দর্য্য বেষ্টিত ও নর-নারায়ণ পর্বতের স্মৃতি জড়িত প্রাচীনতম এই হিন্দু তীর্থস্থানটির কথা ধর্মীয় গ্রন্থ মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বদরিকাশ্রমে পঞ্চপাণ্ডবগণ ছয়দিন বাস করেছিলেন তাও জানা যায়। আরও জানা যায় যে, একদা এই ধামে ছিল ঋষি শুকদেবের, ব্রহ্মর্ষি নারদের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভারত রচয়িতা মহামতি ব্যাসদেবের সাধনক্ষেত্র। তারও বহুপূর্বে সতীর দেহত্যাগের পর বদরিকাশ্রম তীর্থে এসে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং ভক্তকৃপাময় গরুড়বাহন শ্রীনারায়ণ তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর প্রদানও করেছিলেন। এই তীর্থের নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন — বদ্রীনাথধাম বা বদ্রীধাম, বদরিকাশ্রম বা বদ্রীকাশ্রম, বদরীনারায়ণ বা বদরীক্ষেত্র, ব্যাসতীর্থ বদরীনারায়ণ ইত্যাদি। ব্যাসদেবের সাধনার স্থান অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে ব্যাসতীর্থ এবং বদরী বা বদর কথার অর্থ হচ্ছে কুল-ফল, এইস্থানে অলকানন্দা নদীর তীরে স্বয়ং শ্রীনারায়ণ কুল-গাছের অর্থাৎ বদরী-বৃক্ষের নীচে বসে তপস্যা করেছিলেন বলেই সেই থেকে এই স্থানের নাম হয়েছে বদরীনারায়ণ।

কৈলাসপতি শিবের অধিষ্ঠান হিমালয়ের সর্বত্র হলেও একমাত্র বদ্রীনাথধাম সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম স্থান। এই তীর্থের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীনারায়ণ এবং এই মহাপুণ্যক্ষেত্রের বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমুর্তিটি চতুর্ভূজ। সেই মূর্তিটি শিবাবতার আদি শঙ্করাচার্য্য সেখানের নারদকুণ্ডের জলে নেমে উদ্ধার করেছিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় জলে ডুব দিয়ে পেয়েছিলেন অঙ্গহানি হওয়া কালো পাথরের চতুর্ভূজ নারায়ণের বিগ্রহ (ডান হাতে কয়েকটি আঙুল ভাঙ্গা)। শঙ্করজী তা অলকানন্দার জলে বিসর্জন দিয়ে, পুনরায় কুণ্ডের জলে ডুব দিয়ে অনুরূপ আর একটি বিগ্রহ তুলে আনেন। ঘটনাটি তাঁর কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। তিনি সেই নারায়ণের বিগ্রহটিকে অনুরূপভাবে নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে আবার সেই কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন তৃতীয়বার। সেবারেও যখন জল থেকে একই চেহারাযুক্ত বিগ্রহ উঠে আসে তাঁর হাতে তখন, আচার্য্য শঙ্করজী আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হয়ে যান এবং ভাবতে থাকেন যে, এই অলৌকিকত্বের কারণ কি! একি কোন দৈবী মায়া? ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি দৈববাণী শুনতে পান যে, কলিযুগে এই ভগ্ন বিগ্রহই পূজিত হবে। তখন তিনি শালগ্রাম-শিলা হতে তৈরী প্রাচীন অঙ্গহানি হওয়া বিগ্রহটি মন্দিরের পূজারীগণেদের মতামত নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর যখন দৈবাদিষ্ট হয়ে তাঁর ধর্মমূলক কর্মের উদ্দেশ্যে শিষ্যগণেদের নিয়ে বদ্রীনাথধামে উপস্থিত হন তখন মন্দিরের ভিতর দেখতে পান যে শালগ্রাম শিলায় বদরীবিশালজীর পূজার্চনা হচ্ছে। চিন্তিত আচার্য্য পূজারীদের নিকট হতে বাক্যালাপের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, পাশ্ববর্ত্তী চীনদেশের দস্যুদের আক্রমণ হতে শ্রীবিগ্রহটিকে রক্ষা করার তাগিদে গোপনভাবে নারদকুণ্ডের মধ্যে রাখা হয়েছিল কিন্তু, পরবর্তীক্ষেত্রে অনেক চেষ্টা করেও পূজারীগণ তাঁকে পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আদি শঙ্করাচার্য্যের উপরিউল্লিখিত শুভ পদক্ষেপের ফলে কলিযুগ হতে চতুর্ভূজের মধ্যে ভগ্ন দ্বিভুজ, জটাধারী ও হৃদয়ে ভৃগুপদ চিহ্নযুক্ত শ্রীনারায়ণ, শান্ত সমাহিত, পদ্মাসনে উপবিষ্ট সাক্ষাৎ যোগমূর্তি বিগ্রহটি মন্দিরের মধ্যে নিত্য পূজিত হয়ে চলেছেন আজও অবধি। বদরীবিশালজীর এখনকার মন্দিরটিও শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা নির্মিত এবং ধর্মপ্রাণা মহারাণী অহল্যাবাঈয়ের দ্বারা পরবর্তী ক্ষেত্রে পুনর্নির্মিত হয় মন্দিরের স্বর্ণশিখর, তাও ধর্মগ্রন্থ হতে জানা যায়। আরও জানা যায় যে, আদি শঙ্করাচার্য্যের আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি এই মহাপুণ্য তীর্থস্থানেই হয়েছিল।

....ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১)

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪২

জ্ঞানশক্তি সমারূঢ়ং, তত্ত্বমালা বিভুষিতং, ভুক্তিমুক্তি প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪২।।

ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞান, এবং দেহকে আত্মবোধে যে জ্ঞান তাহাকেই অজ্ঞান বলে। ব্রহ্ম সম্পত্তিকে দৈব সম্পত্তি, এবং দেহ বা দেহ সম্পর্কীয় জাগতিক সম্পত্তিকে আসুরিক সম্পত্তি বলে; দৈবী-সম্পদ মুক্তির কারণ, এবং আসুরিক সম্পদ বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে (গীতা ১৬ অঃ ৫ম শ্লোক দেখ)। এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ শক্তিপদে (ব্রহ্মপদে) সমারূঢ় হইয়া জীব ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তত্ত্বমালার দ্বারা বিভূষিত হয় (তত্ত্বগণ — ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব— উর্দ্ধ হইতে নিম্নে এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধে মালাবৎ বিচরণ করিতেছে), সেই মালা অবলম্বন করিয়া যিনি বিভূষিত হইয়াছেন অর্থাৎ মালা তাঁহার বন্ধনের কারণ নহে বলিয়া ভূষণস্বরূপ হইয়াছে; এমত ব্যক্তি তত্ত্বসম্পর্কে জগতের বস্তু ভোগ করিতেছেন, পরন্তু জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন বলিয়া, ভোগ নির্লিপ্তভাবে হইতেছে এবং বন্ধনের কারণ হইতেছে না, এবং ভোগান্তে জীবের মুক্তিপদ বা জ্ঞান পদে স্থিতি হয় বলিয়া, গুরু ভুক্তি ও মুক্তি দাতা; এমত গুরুকে নমস্কার।।৪২।।

অনেকজন্মসংপ্রাপ্তকর্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪৩।।

আত্মজ্ঞানপ্রদানেন অনেকজন্মসংপ্রাপ্তকর্মবন্ধবিদাহিনে (অনেকানিজন্মানি তেভ্যঃ সংপ্রাপ্তকর্মবন্ধানি তেষাং বিদাহিনে) তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪৩।।

বহুজন্মার্জিত কর্মবন্ধনের উচ্ছেদ আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা হয়; সেই আত্মজ্ঞান যাঁহার সংযোগে আসিয়া পাইলাম, তাদৃশ গুরুকে নমস্কার।।৪৩।।

ইচ্ছার দ্বারা জন্ম হয়, গুরুপদে গেলে আর ইচ্ছা নাই; সুতরাং ইচ্ছার নাশে জন্মও নাই। গুরুপদে থাকিয়া বাহ্যকার্য্য করিলে ইচ্ছার বস্তু সংযোগে আসিয়াও নির্লিপ্তভাবে কার্য্য হইয়া জীব ইচ্ছার বশীভূত হয় না, সুতরাং সে জন্মমৃত্যুর অধীনে যায় না।।৪৩।।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪৪।।

গুরুঃ পাদোদকং ভবসিন্ধোঃ সম্যক্ শোষণঃ সারসম্পদঃ চ জ্ঞাপনং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪৪

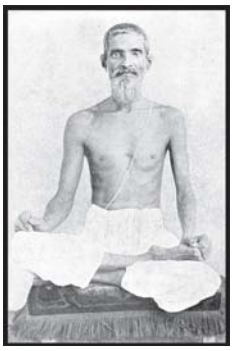

গুরুর পাদোদক (জ্ঞানামৃত রস), (অজ্ঞানরূপ) ভবসিন্ধুশোষক এবং সারসম্পদের (দৈবসম্পদের) জ্ঞাপক। ব্রহ্মই সারসম্পদ এবং উহা অসার জাগতিক সম্পদ নহে; আসুরিক সম্পত্তি অধিকারে জীব মৃত্যুমুখে যায়, পরন্তু ব্রহ্মলাভে জীব অমর হয়। ব্রহ্মক্রিয়ান্তে ক্রিয়ার পরাবস্থায় কণ্ঠমূলে বায়ুর স্বতঃ স্থিতি হয়, তখন জীব শান্তিবারি পান করে, উহাই গুরুপাদোদক, উহা অমরত্বপ্রদ। এমত অমৃত যথা হইতে নিঃসৃত হয় তাদৃশ গুরুব্রহ্মকে নমস্কার।।৪৪।। *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

জন্মাষ্টমী — ২৫শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা
মহালয়া — ৩০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
নবরাত্রি দুর্গাপূজা — ১ - ১১ই অক্টোবর
৬ই অক্টোবর (পঞ্চমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান
৮ই অক্টোবর (সপ্তমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান
৯ই অক্টোবর (অষ্টমী): শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার তিরোভাব দিবস উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা
১০ই অক্টোবর (নবমী): দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাপ্রসাদ
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ১৫ই অক্টোবর,শনিবার

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

(২)

রাজপুত প্রথা অনুসারে যখন কাহারো স্বামীর মৃত্যু হয়, তখন তাহাকে ছয় মাস একটি গৃহের কোণায় পর্দ্দার আড়ালে থাকিতে হয়। কিন্তু রূপার মেজ-জা অর্থাৎ ভুর কঁৰর (কাকিসা) রূপার প্রতি এই নিয়ম পালনের প্রতিবাদ করিলেন। তাহার যুক্তি হইল রূপা তাহার স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করেন নাই। তাহার শিশু সুলভ সরল স্বভাব। তাহাকে আবার শোক পালনের প্রথা কেন মানিতে হইবে? তিনি রূপাকে এই প্রথা মানিতে দিলেন না।

ভুর কঁৰর নিজেও মাত্র দুই বৎসর স্বামী ইন্দ্র সিংহজীর সহিত ঘর করিয়াছিলেন। তারপর সেই কালান্তক প্লেগ রোগ তাহার স্বামীর জীবন গ্রাস করিয়া লইল। ভাসুর জালিম সিংহজীর স্ত্রীর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। কাজেই এই বৃহৎ সংসারের তিনিই এখন সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে ছিলেন।

রাজপুতদের প্রথা অনুসারে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাহারাই এই শোক সংবাদ জানিতেন, তাহারাই আসিয়া পরিবারে সারাদিন থাকিয়া এই শোক প্রকাশে অংশ গ্রহণ করিতেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহার সর্ব্বাপেক্ষা শোকগ্রস্ত হইবার কথা সেই রূপ কঁৰর কিন্তু ধীর, স্থির এবং ভাবলেশহীন হইয়া ভাবিতেন যে, ''এত শোক করিবার কি কারণ আছে? আমার মধ্যে তো কোনই শোক হইতেছে না। আমি যাহার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করি নাই তাহার জন্য আমার মত একজন রাজপুত মেয়ের অশ্রু বিসর্জন করা অর্থহীন। নকল অশ্রুপাত আমার দ্বারা হইবে না। ইহারা কেন এত শোকে মুহ্যমান?'' রূপা বাইসা এই কথাই কেবল চিন্তা করিতেন।

এইভাবে যখন ১২ দিনের শোকান্ত হইল, তখন রূপা বাইসা বিবাহের পোষাক ও চূড়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদের প্রথামত বিধবার পোষাক ধারণ করিলেন। তাহার পর ছয় মাস যখন পূর্ণ হইল তখন রূপার বড় ভাই রেবত সিংহজী আসিয়া তাহাকে রাবনিয়া লইয়া গেলেন। চন্দ্র সিংহজী রূপার এই বৈধব্যের বেশ দেখিয়াই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যাহাকে সুসজ্জিত করিয়া নববধূরূপে পাঠাইয়াছিলেন, সে এখন কি বেশে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ইহার দশদিন পরেই ভাসুর জালিম সিংহজী আসিয়া রূপাকে বালা লইয়া গেলেন। এই সময় রূপার অতি স্নেহের ছোট ভাইটিও রূপার সহিত বালা আসিয়াছিল।

রূপ কঁৰরজী এবং কাকিসা—রূপ কঁৰরজীর জীবনে এই মেজ-জা একটি মহত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহার বিষয়েও কিছু জানিবার প্রয়োজন আছে।

ভুর কঁৰরের পিতার মৃত্যু হইয়াছিল তাহার বাল্য বয়সে। তাই তাহার মাতা অনেক দারিদ্র্যতার মধ্যে তাহাদের লালন-পালন করিয়াছিলেন। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তাহাকে বালার ইন্দ্র সিংহজীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ভুর কঁৰরের মধ্যে চরিত্রের দৃঢ়তা, সাহস এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি অধিক লেখাপড়া করার সুযোগ পান নাই। কিন্তু তিনি নিয়মিত সদ্গ্রন্থ পাঠ, যেমন রামচরিত মানস, গীতা পাঠ প্রতিদিন করিতেন। তাহার সাহসিকতার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। একবার তাহার ভাসুর জালিম সিংহজীকে পুলিশ একটি ডাকাতির কেসে জড়িত বলিয়া সন্দেহ করে। সেইমত তাহারা ঠিক করিল যে, জালিম সিংহের অনুপস্থিতিতে তাহারা তাহার গৃহে তল্লাসী করিয়া দেখিবে যে কোন ডাকাতির মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায় কিনা। তাহাদের এই পরিকল্পনা পূর্ব হইতেই ভুর কঁৰর জ্ঞাত হইয়াছিল। তিনি তখন খোলা তরোয়াল হস্তে ধারণ করিয়া দ্বার রক্ষকের ভূমিকা পালন করিলেন এবং পুলিসের লোকেদের দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, ''কে আছিস মায়ের ব্যাটা, সাহস থাকে তো চলে আয়।'' ভুর কঁৰরের এই বীরত্ব পূর্ণ ভূমিকা দেখিয়া পুলিসের লোকেরা তখন ভয়ে পালাইয়া গিয়াছিল।

এই ভুর কঁৰরের প্রভাবে জালিম সিংহজীর মতিচ্ছন্ন ভাবেরও পরিবর্তন হইয়াছিল।

মানসিংহজী—মানসিংহজী এই জালিম সিংহের পুত্র ভুর কঁৰরকে 'কাকিসা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন আর রূপা বাইসাকে বলিতেন 'মিঠা কাকিসা'। মানসিংহের সম্বোধন

অনুসারে পরিবারের সকলেই ভুর কঁৱরজীকে 'কাকিসা' বলিয়াই ডাকিতেন। ইহার পরে বাপজীর ভক্তগণও তাহাকে কাকিসাই বলিতেন। সেজন্য আমরা 'কাকিসা' বলিয়াই তাহাকে উল্লেখ করিব।

বৈধব্য জীবনযাপন—রূপ কঁৱর তাহার বৈধব্য জীবন অতি কঠোরতার সহিত পালন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি পালঙ্ক-শয্যা ছাড়িয়া ভূমিতে শয্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র সামান্য আহার করিতেন, তাহাও একখানি মাত্র বাজরার রুটি। উহা হইতেও অর্ধেক গরু বা কুকুরকে খাওয়াইয়া দিতেন। তাহার ভোজনের সময় কেহ যদি না উপস্থিত থাকিত, তখন সমগ্র ভোজন সামগ্রীই তিনি গরু অথবা কুকুরকে ভোজন করাইতেন। একাদশীর দিন কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতেন না।

প্রতিদিন রাত্রি তিনটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম এবং স্নানাদি সারিয়া লইতেন। তাহার পর জাঁতাকলে বসিয়া সারাদিনের ব্যবহারের বাজরা পিশিয়া আটা বানাইতেন। কোনো কোনো দিন লোকজন একটু বেশী হইলে চল্লিশ কেজির মতও আটা বানাইতে হইত। এই কার্য্য তিনি একনাগাড়ে বসিয়া করিতেন। ইহার পর গরু এবং বলদের জন্য বিচুলি ও বাজরা মিশাইয়া দলিয়া মিশ্রণ বানাইতেন। বাজরা পেশার কাজ শেষ হইলে গরুর দুগ্ধ দোহনের কাজ করিতে হইত। তারপর পশুদের তিনি দানা-পানি দিতেন। ইহার পর দোহন করা দুগ্ধকে জ্বাল দিতেন। এই সমস্ত কাজ সমাপ্ত হইলে কাকিসা অর্থাৎ ভুর কঁৱরের নিকট গীতা পাঠ শুনিতেন। পাঠ শেষ হইলে দধি লইয়া মাখন তৈরী করিতেন এবং সেই মাখন জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিতেন। এই সময় পশুরা বনে চরিয়া বেড়াইত বলিয়া পশুশালায় যাইয়া সমস্ত গোবর একত্র করিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং তাহার দ্বারা ঘুঁটে বা ঐ-জাতীয় জ্বালানী প্রস্তুত করিতেন। তখন তিনি পশুদের থাকিবার স্থানটিও পরিষ্কার করিয়া আসিতেন। এই সকল কর্ম সমাপ্ত হইলে তিনি রন্ধনশালায় যাইয়া রন্ধনের জন্য সমস্ত কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তাহার হাতে তৈরী বাজরার রুটি সকলেই খুব পছন্দ করিতেন। ক্ষেতে যাহারা কাজ করিতে যাইত তাহাদের জন্য গাঠ্‌রী করিয়া খাদ্য-দ্রব্য বানাইয়া দিতেন। তারপর পরিবারের সকলের আহার অন্তে নিজে অর্ধেক রুটি আহার করিতেন। আহার অন্তে কাকিসা রামচরিত মানস এবং শ্রীভগবত গীতা পাঠ করিতেন। তখন পরিবারের লোকজন এবং গ্রামের অনেক মহিলারাও তাহা শুনিতে আসিতেন। এই পাঠ শ্রবণ সমাপ্ত হইতেই আবার রাত্রে খাবার প্রস্তুত করার সময় হইয়া যাইত। এই সময় অর্থাৎ গোধূলিতে পশুরাও ফিরিয়া আসিত। তখন আবার তাহাদের দানাপানী দিতে হইত। ইহার পর দুগ্ধ দোহনের কার্য্যটি করিয়া তাহাকে জ্বাল দিয়া রাখিতে হইত। দুগ্ধ ঠাণ্ডা হইলে তখন দধি প্রস্তুত করিতে হইত। এইভাবে রাত্রির ভোজন পর্ব সমাপ্ত হইত। তারপর রূপ কঁৱর এবং কাকিসা ভজন এবং সৎসঙ্গ করিতে বসিতেন। তখন পরিবারের অন্যান্য মহিলারাও আসিয়া তাহা শুনিতেন। সকলেই অতীব আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন, রূপ কঁৱর অর্ধরুটি আহার করিয়া, কখনো গুপ্তভাবে উপবাস করিয়া প্রসন্নচিত্তে এত পরিশ্রম করে কেমন করিয়া। এইভাবে সমস্ত দিনই তাহাকে এত পরিশ্রম করিতে হইত যে, সারাদিনে এক মুহূর্তও তিনি অবকাশ পাইতেন না। সকলে ইহাও ভাবিতেন যে, এত পরিশ্রমের পর নিশ্চয়ই তিনি শয্যায় যাইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু তাহার গুপ্ত সাধনা কেহই জানিতে পারিত না। তিনি রাম-নাম শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতেন। রাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িত, তখন তিনি উঠিয়া গৃহের একটি কোণায় পদ্মাসনে বসিয়া জপ ও ধ্যানে লীন হইয়া থাকিতেন। রাত্রে তিনি মাত্র দুই বা তিন ঘন্টা নিদ্রা যাইতেন। আবার কোনো কোনো দিন ধ্যানে এতই মগ্ন থাকিতেন যে কখন যে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেন না। তাহার নিকট সাধনাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সারাদিনের কর্মের মধ্যেও তিনি রাম-নাম জপ করিয়া চলিতেন। এইভাবে শ্বাসে-শ্বাসে তাহার জপ হইত। আটা পেশাই করার সময় এই জপ তাহার গভীরভাবে চলিত। কখনো নাম করিতে করিতে তাহার অশ্রুধারা নির্গত হইত। দিনের বেলায় তাহার কর্মধারা দেখিয়া কাহারো বুঝিবার উপায় ছিল না যে, অন্তঃসলিলা নদীর মত তাহার মধ্যে নামজপের প্রবাহ চলিতে থাকিত। রূপ কঁৱর তাহার ব্যক্তিগত সাধনা ছাড়াও সৎসঙ্গ করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কাকিসাও ছিলেন তাহারই মত ধর্মপ্রাণ ও ধার্মিকগুণাবলীর অধিকারী। তাহারও সৎসঙ্গে গভীর অনুরাগ ছিল। রূপ কঁৱরের পিত্রালয়ের রাবনিয়া গ্রামের লালজী নামে একজন অতীব প্রভু ভক্ত এবং সাধক ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানচর্চা ও ভজনে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। কাকিসা তাঁহার দ্বারা এতই প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গৃহে আনিয়া ভজন

শুনিতেন ও সৎসঙ্গ করিতেন এবং তাঁহাকে তিনি নিজের ধর্মভাইরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লালজীও সময় সময় বালা গ্রামে আসিয়া তাহাদের নিকট দুই চার দিন থাকিয়া ভজন-কীর্ত্তন এবং সৎসঙ্গ করিয়া সকলকে পরমানন্দ দান করিতেন। এইরূপ প্রেমজী নামে এক ব্রাহ্মণ এবং মুঁগহর বাবা নামে এক সন্ন্যাসী, যিনি পূর্ব আশ্রমে একজন রাজপুত ছিলেন মাঝে মাঝে আসিতেন এবং কাকিসা ও রূপ কঁৱরের ধর্ম পিপাসা মিটাইতে তাহাদের গৃহে আসিয়া সৎ গ্রন্থপাঠ ও ভজন-কীর্ত্তন করিতেন। ইহারা ছাড়াও অন্য কোনো সাধু সন্ন্যাসী যদি বালা গ্রামে ভিক্ষা করিতে আসিতেন তাহাদেরও ইহারা ভিক্ষা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেন। এই ভাবে সকল কাজের মধ্যেও ধর্মচর্চা তাহাদের মধ্যে নিত্য চলিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কাকিসা বাল্যকালে অত্যন্ত দরিদ্রতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। এইজন্য সংসারে তাহার মিতব্যয়িতা প্রায় কার্পণ্যের পর্য্যায়ে পরিণত হইত। রূপকঁৱর প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় একটি করিয়া ধূপকাঠি জ্বালাইয়া জপ করিতে বসিতেন। কিন্তু এত খরচ করা কাকিসার পছন্দ হইত না। তখন তিনি ধূপকাঠিকে তিন টুকরো করিয়া তাহাকে জ্বালাইবার জন্য দিতেন। আবার কখনও রূপ কঁৱরের ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিবার প্রয়োজন হইলে কাকিসার কাছে সূচ-সুতা চাহিতেন, তখন তিনি সেই ছিন্ন স্থানটি সেলাই করিতে যতটুক সূতা প্রয়োজন আন্দাজ করিয়া মাত্র সেইটুকুই সুতা তাহাকে দিতেন। এইভাবে বহু প্রকারে রূপ কঁৱরের প্রতি কাকিসার শাসন এক প্রকার অত্যাচারই ছিল। যদিও তাহার এইরূপ আচরণকে মিতব্যয়িতা বলিয়া বাহাদুরী দেওয়া হইত। কখনো কখনো কাকিসা রূপ কঁৱরকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

রূপ কঁৱরের বাল্যকাল হইতেই শুদ্ধভাবে থাকা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে আসিয়া তিনি খালি পায়েই চলাফেরা করিতেন। সেই জন্য পা দুইটি সর্বদাই অপরিষ্কার এবং ফাটিয়া থাকিত। বিশেষতঃ পশুদের ঘর পরিষ্কার করিতে পায়ে খুবই গোবর ইত্যাদি লাগিয়া থাকিত। এই জন্য তিনি পদদ্বয় ভাল করিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতেন। কখনো কখনো পায়ের ফাটার মধ্যে জমা ময়লা পরিষ্কার করিতে অনেকক্ষণ লাগিত। তাহা দেখিয়া কাকিসা ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিতেন, ''কাহার জন্য পদদ্বয় অমন ঝক্‌ঝকে করিয়া পরিষ্কার করিতেছ?'' কিন্তু কাকিসা রূপ কঁৱরকে স্নেহও করিতেন এবং সর্বদা তাহার প্রতি নজর রাখিতেন। কাকিসা ও রূপ কঁৱর দুইজনেই পরস্পরকে ভালবাসিতেন, কারণ দুই জনই ছিলেন ভগবদ্ ভক্ত এবং সৎসঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথানুসারে 'জটিলা-কুটিলা বা জগাই-মাধাই না থাকিলে লীলা পুষ্টাই হয় না।' সেইরূপ, রূপ-কঁৱরের জীবনেও আসিল এক প্রচণ্ড অপবাদ। তাহার খুড়ী শ্বাশুড়ীর স্বভাবই ছিল সৎ ব্যক্তিকে হিংসা করা এবং তাহার চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা। তিনি কাকিসা ও রূপ কঁৱরের বিষয়ে যত্রতত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এরা বিধবা হইয়া এত সাধু সজ্জনের পিছনে ছোটে কেন? কেনইবা এত আগ্রহ? ইহার পিছনে নিশ্চয়ই কোন গুঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। লালজী দর্জি রাবনিয়া গ্রাম হইতে আসিয়া সৎসঙ্গের নামে গৃহে থাকিয়া যায়। নিশ্চয়ই পূর্ব হইতেই রূপ কঁৱরের সহিত তাহার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গ লইয়া তিনি একটি মনোরম ও মুখোরোচক কাহিনী রচনা করিয়া প্রচার করিলেন যে, ''এই লালজীর দ্বারা রূপ কঁৱরের গর্ভে সন্তান আসিয়াছিল। লালজী সেই সন্তানকে গর্ভপাত করাইয়া এইখানেই কোথাও পুঁতিয়া রাখিয়াছেন।''

যে রূপা বাল্যকাল হইতেই অত আদরে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, পিত্রালয়ের সেই স্মৃতি মনে পড়িত, আর আজ তাহার অদৃষ্টে এত দুর্নাম, অপমান ও চরিত্রহানির কলঙ্ক তাহাকে অত্যন্ত মর্মপীড়া দিত। মনের দুঃখে তিনি একান্তে যাইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া আসিতেন আর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যখন বাজরা পিশিতে বসিতেন, তখন তাহার দুই চক্ষের অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইত। তখন তিনি বিচার করিতেন যে, ''আমার পরিবারের লোকেরা কি দারুণ মমতায় আমাকে কত সুখে রাখিয়াছিল, আর এখন এইরূপ অপবাদ! তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার কোনো জন্মের কর্মফলের জন্যই আমাকে এই পরিবারে আসিতে হইল!'' এইভাবে বিশ্লেষণ করিতে করিতে ক্রমে তাহার দুঃখের তীব্রতা কমিয়া আসিত। তিনি তখন সর্বদা রাম-নাম করিতে লাগিতেন এবং তৎভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

এই খুড়ী-শ্বাশুড়ীর ভবিষ্যৎ জীবনে ক্যান্সার হইয়া নাকের ভিতরে পোকা কিলবিল করিত। সেই ঘায়ের গভীর যন্ত্রনায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

গীতা ভাবনা
(২৬)

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজি সম্পর্কে বলেছেন — ''বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছড়াল বিশ্বময়।'' স্বামী বিবেকানন্দ ভারত আত্মার প্রতিভূ এবং ভারতের সদাজাগ্রত চিন্তার বাহক। ভারত আত্মার বিবেককে যাঁরা বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দের একটা বিশেষ স্থান আছে।

পরাধীন ভারতে একটা বিশেষ কালখণ্ডে এই ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব; যখন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ এবং আরও অনেকে বেদ-বেদান্তের মধ্যে ভারতাত্মার সন্ধান করছেন এবং বহির্ভারতে সেকথা সদর্পে প্রকাশ করেও বেড়াচ্ছেন। মাত্র ৩৯ বছরের জীবনলীলায় বিচিত্র কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত থাকার জন্য ভাষণ, পত্রলিখন ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি সময় পেয়েছিলেন মাত্র বছর সাতেক। অথচ এই সামান্য সময়ের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যাদেশে কী বিশাল কর্মযজ্ঞের জাল তিনি বিস্তার করেছিলেন সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বিবেকানন্দ মানবতার সাধক। একটা পরাধীন জাতিকে নতুন চৈতন্যে উদ্বোধিত করার জন্য এবং বিশেষভাবে উপনিষদের চৈতন্যে জ্বলে ওঠার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট। তাঁর মধ্যেকার প্রতিভা বিচিত্রমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়নি; অথচ তাঁর মধ্যেকার আর্ষসত্ত্বা তাঁকে ঋষি করতে পারত, যোগ্য রাজনীতিবিদ্ করতে পারত, বিশিষ্ট সমাজসেবক বা সাহিত্যসেবক করতে পারত, কিংবা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ প্রতিষ্ঠাও দিতে পারত। অথচ বিবেকানন্দ এসব রাস্তায় না হেঁটে বিবেকানন্দ হয়েই রইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ ও সমন্বয়ধর্মী তেমনি আত্মবোধের প্রকাশের ভাষাটিও ইস্পাতের মতো ধারাল। অসাধারণ কষ্ট সহ্য করে ঠাকুরের আশীর্বাদে শিকাগো ধর্মসম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তিনি সমাগত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করলেন, ''আমার আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনেরা'' বলে। পৃথিবীর অন্যধর্মের প্রচারকেরা দরিদ্রের সেবা করতে পারেন, তাদের বাস্তব জগতে উন্নতির জন্য প্রাণপাত করতে পারেন; কিন্তু অমৃতের পুত্র হিসাবে সকলকে আত্মার আত্মীয় করে নিতে পারেন না। বেদে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'পিতা নোহসি' অর্থাৎ, তুমি আমাদের পিতা। ফলে দিব্যধামে যেখানে যত অমৃতের পুত্র আছে সবাই আমার আত্মার আত্মীয়। উপনিষদের ভাষায় — 'সব কিছুই সেই একেরই বিভূতি।' আচার্য শঙ্করও সকলকে শিবপুত্র হিসাবে ভাবনার জন্যে অন্নপূর্ণাস্তোত্রে বলেছেন —

''মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্।।''

এসব শাস্ত্রবাণীকে বোধিরস্তরে গিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি পৃথিবীর সকলকে আত্মীয় করে নিতে পেরেছিলেন। স্বামীজির বেদান্ত তার্কীকের শুষ্ক বিচার নয়, প্র্যাকটিকাল বেদান্ত, যেখানে মানবপ্রীতি ও ভগবৎপ্রীতির মধ্যে পার্থক্য নেই। ব্যাপারটাকে স্বরচিত একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন তিনি —

''ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।''

বিবেকানন্দের এই ব্যাপক দৃষ্টির জন্যই সাবলীলভাবে মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী সকলকেই ভাই বলতে পেরেছেন, আত্মার আত্মীয় বলতে পেরেছেন।

প্রাচীন ভারতের কৃষ্ণ গীতার বাণীতে সাংখ্য-যোগকে এক করে দিয়েছেন — ''সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ''। এই যোগ সমন্বয়ের ধারা বেয়ে পাগল ঠাকুর বললেন ''যত মত তত পথ''। একেই নতুন ভাবে মেলে ধরলেন স্বামীজি। শঙ্করের উপর তাঁর অসীম শ্রদ্ধা থাকলেও এবং অদ্বৈতবাদী হলেও, শঙ্করের পথের থেকে তাঁর পথ ভিন্ন। শঙ্কর যখন সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য স্বয়ং শিবরূপে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ, সাংখ্যবাদী তথা নৈয়ায়িকেরা। ফলে তাঁকে এমনভাবে যুক্তিজাল সাজাতে হল তাতে মনে হল — তিনি বোধ হয় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তেমনি প্রচারকালে স্বামীজি প্রতিপক্ষ হিসাবে পেয়েছিলেন — প্রবলপরাক্রম খ্রিস্টান, ইহুদী ও মুসলমানদের। ভারতের জাতপাতবাদী কিছু সংগঠন যেমন শূদ্রকূলেজাত তাঁকে প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল তেমনি পূর্বোক্ত ধর্মসংগঠকরাও অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তজাল বিস্তার করেছিল। অনন্য সাধারণ মনীষা,

বাক্‌কৌশল এবং বৈদান্তিক দৃষ্টিতে সবকিছুকেই সহজে উপেক্ষা করে বিশ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন তিনি। তাই সত্যিই তিনি বীরসন্ন্যাসী। *...ক্রমশঃ*

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ

(১৫)

শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রী থেকে —

প্রথম দর্শন —

স্থান ৫নং রামতনু বসু লেন,
সিমলা, কাঁসারীপাড়া
অগাষ্ট মাস ১৯১৬ বঙ্গাব্দ

তখন আমি পাবনা জেলার রাধানগরের মজুমদার বাবুদের বাসাবাটিতে থাকি। শ্রীনলিনী রঞ্জন রায় (পরবর্তীকালে পাবনা -অধুনা বাংলাদেশ - এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন) ও আমি একত্রে থাকিয়া পড়াশুনা করি। আমি বি.এ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।

একদিন বিকেল পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা হবে। বহির্বাটিতে ছোট একটি ঘর। সেখানে একটি তক্তপোষে উবু হয়ে বসিয়া বালিশে ভর দিয়া পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিয়া আছি। এমন সময় — ননীদা (শ্রীনলিনী রঞ্জন রায়) একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আমারই ছোট তক্তপোষের একধারে বৃদ্ধকে বসিতে নির্দেশ দিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেলেন। সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে বসিবার জায়গা দিলাম। বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিবার সময়ও পৈতা ধরিয়া করে-জপ করিতেছিলেন। তক্তপোষের প্রান্তে বসিয়া চরণ দুটি ঝুলাইয়া সেই জপই করিতে লাগিলেন। চোখমুখের হাবভাব, চাহনি ও জপের ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিতে আমার কোন দ্বিধাবোধ হইল না।

তিনি আপনমনে উচ্চৈঃস্বরে ''হরি, হরি'' জপ করিতেছিলেন। আমি বিস্ময়চোখে দেখিতে লাগিলাম। ননীদা ইঁহাকে কোথায় পাইলেন, কেনই বা লইয়া আসিলেন, ইঁহাকে এখন আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন - কিছুই বুঝিলাম না। আশা করিতেছি ননীদা সত্বরই ফিরিবেন। এইভাবে ১৫/২০ মিনিট কাটিয়া গেল।

এতক্ষণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কার্য্যকলাপ সবিস্ময়ে দেখিতেছিলাম। দেখিলাম, জপ করিতে করিতে নানাবিধ ভাবভঙ্গীসহ কাহার সঙ্গে যেন কথা বলিতেছেন, আমরা যেমন মুখোমুখী বসিয়া দুইজনে কথাবার্তা বলি। যেন টেলিফোনের একপ্রান্তে কেহ কথা বলিতেছে, আমি শুনিতেছি। ''তোকে তো আমি অনেক বারই বলেছি''..... ''আমার কথা কি কিছুই নয়''..... ''মা, আমি কি তোর সন্তান নই''..... ''অমন করে কি ভয় দেখাতে আছে।''.....

''তুই যাই বলিস না কেন, সে হবে না, আমার কথা তোকে এবারটি রাখতেই হবে''..... ''কি! শুনবি না! কোনমতেই না? তোকে শুনিতেই হবে''.....। পরক্ষণেই সামরিক কায়দায় চীৎকার করিয়া আদেশ দিলেন, ''ফায়ার, ফায়ার, ফায়ার''। সেই অদৃশ্য মূর্তির দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া রহিলেন। আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। এমন তীক্ষ্ণ মিলিটারী কমাণ্ড কেবল কুচকাওয়াজের সময়ই মাঠে ময়দানে শোনা যায়। এইভাবে ঝগড়া করিতে করিতে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ আবার নিম্নস্বরে জপ চলিতে লাগিল। তারপর আবার বলিতেছেন, ''মা, আমি তোর অধম সন্তান, আমাকে কি ভয় দেখাতে আছে? এই তো হল!''

ইহার পর বেশ সুস্থভাবে জপ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আনন্দে যেন আত্মহারা হইতে লাগিলেন। এমনভাবে উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন যে ঘরখানা মুখরিত হইয়া উঠিল। সে হাসি আর থামে না। এক একবার থামিতে চেষ্টা করেন, পরমুহূর্তেই দ্বিগুণ নিনাদে হাসিয়া উঠেন। হাসিতে হাসিতে যেন ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আমার ভয় হইতে লাগিলে যদি না এ হাসি বন্ধ হয়, হয়তো বা দম বন্ধ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন। যাহা হউক, চার-পাঁচ মিনিট পরে কোনমতে সুস্থ হইলেন।

—শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

চতুর্বিংশপর্য্যায় — (বেন)

ঋগ্বেদের যুগ থেকেই বেন নামক দেবতার খ্যাতি থাকলেও তাঁকে অপ্রধান দেবতাদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বেনের স্তুতি করা হয়েছে একটা সম্পূর্ণ সূক্তে (১০/১২৩), অন্যত্র বহু স্থানে আমরা বেন পদটির উল্লেখ পাই (১/৩৪/১, ১/৪৩/৯, ১/৫৬/২, ১/৬১/১৪, ১/৮৩/৫, ২/২৪/১০, ৪/৫৮/৪, ৫/৩১/২, ৬/৪৪/৮, ৮/৩/১৮, ৮/৬৩/১, ৮/১০০/৫, ৯/২১/৫, ৯/৮৫/১০, ১০/৬৪/২, ১০/৯৪/১৪) কখনও কখনও বিভিন্ন দেবতার বিশেষণ হিসাবেও বেন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দেবতার স্বরূপ নিয়ে বৈদিক সাহিত্যে একটা মতভেদ ছিল বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। ঋগ্বেদের ১০/১২৩/১ মন্ত্রে বেনকে অন্তরিক্ষের দেবতা বলা হয়েছে। এই সূক্তটির দ্রষ্টাও হলেন বেন ঋষি। ঋষি সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই বলেছেন —

''অয়ং বেনশ্চোদয়ৎপৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ূ রজসা বিমানে।

ইদমপাং সঙ্গমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি।।''

অর্থাৎ, বেন নামক দেবতা জ্যোতিদ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জলনির্মাণকারী আকাশ মধ্যে সূর্য্যকিরণের সন্তান স্বরূপ জলেদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্য্যের সাথে জলের মিলন হয় তখন বুদ্ধিমান স্তবকারিগণ সেই বেন দেবকে বালকের মত নানা মিষ্ট বচনের দ্বারা স্তুতি করেন।

পরের মন্ত্রটিতেই বলা হয়েছে যে আকাশে তিনি দৃষ্ট হন। আধুনিক পণ্ডিতেরা এনার স্বরূপটি ভালভাবে বুঝতে পারেননি বলে মন্তব্য করেছেন —''বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোন দেবতাকে বেন নামে উপাসনা করা হয়েছে। আলোচ্য সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই বেনকে 'পৃশ্নিগর্ভা' বলা হয়েছে। সেই শব্দটির সূত্র ধরে পণ্ডিতেরা তাঁর স্বরূপ অনুসন্ধান আরম্ভ করেছেন। যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন — ''পৃশ্নিগর্ভাঃ প্রাষ্টবর্ণগর্ভা আপ ইতি বা'' (নিঃ ১০/৩৯/২)। পৃশ্নি শব্দের অর্থ আদিত্য, কারণ প্রাষ্টবর্ণ বা উজ্জ্বলবর্ণ তাকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে। আবার পূর্বোক্ত মন্ত্রটিতেই তাঁকে 'জ্যোতির্জরায়ু' বলা হল। এই শব্দটির ব্যাখ্যা করে যাস্কাচার্য বললেন — ''জ্যোতির্জরায়ুজ্যোতিরস্য জরায়ুস্থানীয়ং ভবতি'' (নিঃ ১০/৩৯/৩)। জরায়ুর দ্বারা গর্ভ যেভাবে বেষ্টিত থাকে, বেন দেবতাও তেমনি জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। বেদাঙ্গের মন্ত্রার্থ আলোচনা থেকে বেনকে অন্তরিক্ষবাসী মধ্যমস্থানের দেবতা হিসাবে মনে করা হয়। নিরুক্তে শব্দটির নির্বচন দেখাতে গিয়ে বলা হল — ''বেনো বেনতেঃ কান্তিকর্মণঃ'' (১০/৩৮/১)। নৈরুক্ত ধাতু 'বেন্'-এর অর্থ কান্তি অর্থাৎ ইচ্ছা বা দীপ্তি। বেন দেবতা সর্বলোকের উপকার করেন বলে সকলেরই কান্ত বা অভীপ্সিত, আবার সূর্য দেবতা হিসাবে তিনি স্বভাবতই প্রদীপ্ত। আলোকদান ও মধ্যমাকাশে মেঘের সঞ্চার করা সূর্যের কাজ। তাই ধাতুগত বিচারে বেনকে সূর্যের সঙ্গে একীভূত করে দেখার একটা প্রবণতা ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কাজ করেছে। মূলতঃ বেদমন্ত্র ও নিরুক্তের পর্যালোচনা করেই তাঁরা এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেয়েছেন।

বেন ঋষি দৃষ্ট ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পূর্বোক্ত সূক্তটির আলোচনা করে অধ্যাপক তুলসীদাস মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন —''বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন। এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল। তথায় তিনি দীপ্তি পান। তাঁহার পরিষদেরা সর্বসাধারণ, উৎপত্তিস্থল আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিল। তিনি আবার শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হন। দীপ্যমান হইয়া তিনি তৃতীয়লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোক বাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন।

বেনকে সূর্যের সঙ্গে এক করে দেখার আখ্যান ১০ম মণ্ডলের পূর্বোক্ত সূক্তটিতে আছে, তা ছাড়াও ঋগ্বেদের একাধিক স্থানে সূর্যকেই বেন বলা হয়েছে —''যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি'' (১/৮৩/৫)। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে সূর্যকে পক্ষী হিসাবে দেখা হয়েছে — ঋগ্বেদেরই (১০/১২৩/৬) মন্ত্রে বেনকে আকাশের উড়ন্ত পাখী হিসাবে দেখা হয়েছে —''নাকে সুপর্ণমুপ যৎ, পতন্তং হৃদা বোনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং''। অনেক সময়ে বেনকে গন্ধর্বও বলা হয়েছে। বেদে সূর্যও হলেন গন্ধর্ব (৯/৮৩/৪)।

ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে লেখা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য থেকেও বেনকে সূর্য হিসাবে দেখার একটা ধারা পাওয়া যায় —''অয়ং বেনঃ চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা ইতি। বেনোহস্মাৎ বা ঊর্ধ্ব বা অন্যে প্রাণা বেনন্তি অবাঙ্ চোহন্যে তস্মাৎ বেণঃ প্রাণো

বা'' (ঐ.ব্রা ১/২০)। ব্রাহ্মণে 'এষঃ, অসৌ, অয়ং' পদের দ্বারা সাধারণতঃ সূর্যকে বোঝান হয়। এখানেও বেন সম্পর্কে (অয়ং) পদ ব্যবহার করে সূর্যকে বোঝান হয়েছে। পরবর্তী কালে প্রাণ বলতে সূর্যকে বোঝান হত, ব্রাহ্মণ বাক্যে বেন সম্পর্কে প্রাণ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বেন যে সূর্যের সমপর্যায়ভুক্ত তা বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে শতপথ ব্রাহ্মণের (৭/১/১৪) একটি বাক্যে বেনকে স্পষ্টতই আদিত্য বলা হয়েছে। *...ক্রমশঃ*

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রম সংবাদ

১৫ই এপ্রিল— ১৪২৩-এর নববর্ষের শুভ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের অভিলাষে বহু ভক্ত সমাগত হয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ভক্ত সমক্ষে শিক্ষণীয় কিছু কথা বলেন ও একটি সুন্দর গানের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এইদিন হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটি ও ''মহাবতার বাবাজী মহারাজ — এক সর্বব্যাপী রহস্যের খোঁজে'' - এই বাংলা পুস্তকটি প্রকাশিত হয়।

৯ই মে — অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে শ্রীঅন্নপূর্ণা ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগজাননের পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিপ্রহরে সমাগত ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও সন্ধ্যায় একটি মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই আনন্দপূর্ণ দিনটির পরিসমাপ্তি হয়।

১৭ই মে — এইদিন শ্রীইমতিয়াজ আলি ভাইসাব শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন হেতু আশ্রমে আসেন ও কিছু সময় সৎসঙ্গে ব্যতীত করেন।

২১শে মে — বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা পাতঞ্জল যোগ ও গীতা প্রসঙ্গে শিক্ষণীয় কিছু কথা বলেন। তারপর সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের পর প্রতিবারের মত আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী পরিচালন করেন গুরুভ্রাতা ডাঃ বরুণ দত্ত।

২৯শে মে— এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অনিতা পাল ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ। ইনি স্বনামধন্যা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের একজন সুযোগ্য ছাত্রী।

৭ই জুন- ৬ই জুলাই — পুষ্করনিবাসী সন্ত শ্রীশ্রীটাটবাবা আশ্রমে এই কয়দিন অতিবাহিত করেন। এইসময় আশ্রমবাসীগণ তাঁর পূত সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন।

২০শে জুন — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব তিথি পালিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা অন্নক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী গুরুপূজা। দ্বিপ্রহরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে একটি ভজনের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ।

২৬শে জুন — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার ১৯তম পর্বে উপনিষদ্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

श्रीरामदूत हनुमान

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

'हनुमान' पुराण के एक अतिविशिष्ट महान भगवत् चरित्र है। इन अत्यद्भूत अवतार चरित्र की जन्मकथा भी अति विस्मयकारी है। उल्लेखित है कि सुमेरु पर्वत पर वानरराज केशरी अवस्थान करते थे। इन्हीं वानरराज केशरी के क्षेत्रज और वायुदेव के औरसजात पुत्र थे 'हनुमान'। हनुमान की माता का नाम अन्जना अथवा अंजनी था। अंजना वानरश्रेष्ठ कुंजर की दुहिता थी। एक दिन फल आहरणार्थ अंजना गहन वन में विचरण कर रही थी, ठीक उसी समय वायुदेव भी वहाँ से गमन कर रहे थे, ऐसे समय में अंजना के अप्सरा तुल्य रूपलावण्य को देख वायुदेव अति पुलकित हुए। अंजना के रूप पर मुग्ध होकर वायु (पवनदेव) के आलिंगन करने पर अंजना ने वायुदेव का तिरस्कार किया। तब वायु ने कहा कि उनका अंजना के साथ मानसिक रूप से मिलन हुआ है, इससे उसकी किसी क्षति की संभावना नहीं है। इसके फलस्वरूप उन्हें अति पराक्रमशाली और वायु के सदृश एक वेगवान पुत्र होगा।

तदनन्तर यह कहते हुए वायु ने वहाँ से प्रस्थान किया। कुछ दिन के पश्चात् ही अंजना ने गुहा में हनुमान को प्रसव किया। बालतनय के जन्म लेने के पश्चात् माता अंजना फलमूल आहार संग्रह के लिए गुहा से जब बाहर निकली तभी सद्य प्रसूत हनुमान क्षुधार्त हो क्रन्दन करने लगे। उसी समय आकाश में नवोदित सूर्य को देखकर हनुमान उसे ही फल समझकर ग्रहण करने के लिए उछलते हुए बहु शतयोजन ऊर्ध्व में आकाश में उड़ चले। हनुमान के आकाश में उत्थित होने पर पवन स्वीय पुत्र के प्रति ममता के वशवर्ती होकर उसके अनुगामी हुए। हनुमान धीरे-धीरे आकाश में गमन करते-करते सूर्य के सन्निधान में उपस्थित हुए। किन्तु सूर्य ने उसे शिशु समझकर दग्ध नहीं किया। उसी समय राहु सूर्य को ग्रास करने के लिए उद्यत हुए; किन्तु हनुमान को सूर्यरथ पर देखकर, उसे अपना प्रतिद्वन्दी समझते हुए तब राहु ने इन्द्र के निकट गमन कर अभियोग किया। इन्द्र ने राहु के अनुरोध पर सूर्य के समीप गमन कर हनुमान पर वज्रद्वारा प्रहार किया। उसी वज्राघात से पवन तनय की वाम हनु भग्न हो गयी एवं वे भूतल पर संज्ञाहीन होकर पतित हो गये। तब क्रुद्ध होकर पवनदेव आहत पुत्र को लेकर पर्वत गह्वर में छिप गये। तब सर्वभूतों में विपर्यय की सृष्टि हुई। वायु के अभाव में त्रिलोक में हाहाकार मच गया। वायु संचालन बंद होने पर देवताओं का समूह विपदा की आशंका से ब्रह्मा के पास गया। तब ब्रह्मा ने देवताओं सहित पर्वत गुहा में पवन सन्निधान में उपस्थित होकर हस्तस्पर्श द्वारा वायुपुत्र को जीवनदान दिया। अन्ततः वायु भी आनन्दित होकर पुनराय जगत् में विचरण करने लगी।

तदन्तर समस्त ब्रह्मादि देवगणों ने संतुष्ट होकर हनुमान को वर प्रदान किया। ब्रह्मा से वर प्राप्त कर हनुमान शत्रुओं के भयोत्पादक और मित्र के लिए अभयकारी, अजेय कामरूप, कामचारी कामगामी अव्यहतिगति और कीर्तिमान हुए। इन्द्र ने कहा कि उनके वज्राघात से हनु भग्न हुआ है इसीलिए ये महाबली वायुपुत्र 'हनुमान' नाम से विख्यात होंगे एवं इन्द्र के वज्र से अवध्य होंगे। सूर्य ने कहा, ''मैं इन्हें निज अंश का शततम अंश तेज प्रदान करता हूँ तथा जब ये वायुपुत्र शास्त्राध्ययन करने में समर्थ होंगे, तब मैं इन्हें शास्त्र प्रदान करूँगा। जिससे हनुमान असाधारण वाग्मीता प्राप्त करेंगे।'' वरुणदेव ने कहा कि उनके पाश और जल से अयूतशतवर्षों तक हनुमान की मृत्यु नहीं होगी। यम से वर प्राप्त कर वे यमदण्ड से अवध्य हुए। इसके अतिरिक्त रोगहीनता और अविसन्नता से भी लाभान्वित हुए। कुबेर ने कहा कि युद्ध में हनुमान उनकी गदा से अवध्य होंगे। शंकर और विश्वकर्मा ने भी पवन तनय को अपने अस्त्रों से अवध्य होने का वर प्रदान किया। देवगणों के इस प्रकार वर प्रदान करने के पश्चात् पवन ने अपने पुत्र को अन्जना के हस्त में

समर्पित करते हुए देवताओं द्वारा वर प्रदान वृत्तान्त को सुनाते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। वर प्राप्त कर बलशाली होकर हनुमान ऋषियों के आश्रम में उपद्रव करने लगे। केशरी और पवन द्वारा निषेध करने के उपरांत भी हनुमान ने उनके निर्देशों पर कर्णपात नहीं किया। अवशेष में हनुमान के अत्याचार से पीड़ित होकर भृगु और अंगिरा वंशीय ऋषियों ने हनुमान को शाप दिया। उनके अभिशाप से हनुमान दीर्घकाल तक अपने बल और कीर्ति के संबंध में आत्मविस्मृत रहे। बहु समय पश्चात् रामलीला में सीता उद्धार के समय श्रीरामदूत होकर

सागर-लंघन के पूर्व जाम्बवान द्वारा उनके पूर्ववृत्तान्त का स्मरण करवाने पर तब हनुमान ने अपने को यथेष्ट शक्तिशाली बोध करते हुए 'राम-नाम' लेते हुए एक छलांग में सागर लंघन किया।

सूर्य का शतांश तेज धारण किया था इसीलिए हनुमान को 'रुद्रावतार' कहा जाता है। जो अवतार होकर आते है उनके आविर्भाव के पीछे कारण का भी कारण रहता है, क्योंकि एकाधिक कारण वशत: अवतार अपनी अवतार स्वरूप देह धारण करके रहते है एवं वह देह होती है सगुण ब्रह्म की एक नव रूपायण एवं जिसके मध्य सृष्टितत्त्व का कोई भी निर्दिष्ट विषय का ज्ञान सन्निवेशित रहता है। अवतार-देह साधारणत: भगवत्लीला में अंशग्रहण करने के लिए धारण की जाती है।

'रुद्र' का तात्पर्य भर्गदेव का प्रकाश रूप शिवरूप भी समझा जाता है। इसीलिए हनुमान शिवावतार। इन रुद्ररूपी शिवस्वरूप के पीछे ऋषि मुनियों द्वारा उपलब्धित एक विराट् सत्य निहित है; योगगम्य उपलब्धि के आलोक में देखा गया है कि 'हनुमान' एक अति प्राचीन ब्रह्मज्ञ ऋषि थे। भगवत्स्वरूप के पथ पर उन ब्रह्मज्ञ महर्षि की साधना रुद्रावतार रूप में शिवसायुज्य में भगवान श्रीरामचन्द्र की रामलीला में एक सुमहान चरित्र अवलम्बन कर आविर्भूत हुई थी। भक्तियोग के वैराग्य एवं दास्यभाव की साक्षात् प्रतिमूर्ति थे 'हनुमान'। इसके अतिरिक्त श्रीरामलीला में यौगिक-तात्त्विक रूप से हनुमान के बहुत अवदान हमलोग देख पाते है। साधारण भाव में 'हनु' शब्द का अर्थ हुआ गहुस्थल का उपरिभाग अथवा चोयाल या चिबुक। और यौगिक तत्त्वगत भाव से 'हनुमान' शब्द का अर्थ है 'हंकार' (या हंस का हं युक्त) संयुक्त अणु के (ब्रह्माणु का) मान; अर्थात् आत्मसत्ता का मान या आत्मा के स्वरूप की मान या परिधि। जो कि एक ब्रह्माणु के स्वरूप निर्णयकारी। इसीलिए हनुमान शिवरूप होकर भी शक्ति के प्रतीक, 'मान'रूपी आत्मशक्ति के प्रकाशित तत्त्वगत रूप, सगुण ब्रह्म सनातन के एक अद्भूत अनन्य असाधारण स्वरूप, पंचाननरूपी विराट् पुरुष के और एक प्रतिभू।

प्राचीन युग में शिलाद नाम के एक धर्मात्मा महान ऋषि थे। एकदिन जब वे शिवलोक से प्रत्यागमन कर रहे थे तो उन्होंने अपने पितृगणों को नरक में लम्बमान अवस्था में देखा। उन्होंने शिलाद से कहा कि, उनके दार-परिग्रह ना करने के फलस्वरूप उनकी ऐसी गति हुई है। इसीलिए उन्होंने शिलाद को पुत्र लाभार्थ महादेव की आराधना करने के लिए कहा। पितृगण के निर्देशानुसार महर्षि शिलाद भगवान शंकर की आराधना के लिए प्रवृत्त हुए। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर महादेव ने उन्हें वर प्रार्थना करने के लिए कहा एवं शिलाद ने शिवतुल्य अमर अयोनिज पुत्र की प्रार्थना की। महादेव शिलाद को 'यह प्रार्थना पूर्ण होगी' का वर देकर चले गये, महर्षि शिलाद ने यज्ञभूमि कर्षण करते-करते लाँगल मार्ग में एक परम तेजस्वी कुमार को पुत्र रूप में प्राप्त किया। सर्वप्रथम शिलाद ने उस शिशु की ओर दृष्टिपात नहीं किया। तत्पश्चात् दैववाणी श्रवण कर उन्होंने उस शिशु को ग्रहण किया। वह कुमार उन्हें आनन्द प्रदान करने वाला था इसलिए उसका नाम रखा 'नन्दी' । नन्दी के सात वर्ष के वय:काल में मित्रावरुण नाम के तपस्वीद्वय शिलाद के आश्रम में उपस्थित हुए। शिलाद की सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने भविष्यवाणी की कि शिलाद-तनय नन्दी आठ वर्ष की उम्र में अकाल काल-कवलित हो जाएगा। महर्षि शिलाद यह श्रवण कर अत्यंत दु:खित हुए। नन्दी ने जब अपने पिता के दु:ख का कारण जाना तो मृत्यु को

अतिक्रम करने के लिए वे महादेव की आराधना करने चले गये एवं अति उग्र तपस्या कर महादेव से वर प्राप्त कर जरा और मृत्यु रहित हुए। साधन मार्ग पर-परिपूर्णता के पथ पर यही नन्दी ऋषि ही त्रेतायुग की भगवत्रामलीला में 'हनुमान' के चरित्र में भगवान श्रीरामदूत होकर आविर्भूत हुए थे। 'रामदूत' शब्द में 'राम' का तात्पर्य आत्मा और 'दूत' का अर्थ प्रतिनिधि; अर्थात् 'आत्मा के प्रतिनिधि' जो है, वे है परम विश्वासवान। 'विश्वास' अर्थात् विगत श्वास या श्वास शून्यता या स्थिर-प्राण। स्थिर-प्राण होने से आत्मा और विश्वास हुए उनके मान। अतएव 'हनुमान' हुए 'रामदूत', 'रामरूपी' समस्त आत्मसत्ता के विश्वास रूपी दृढ़-शक्ति के मान। नन्दी ऋषि शिव के प्रधान 'गण' रूप में परिगण्य हुए थे। उन्होंने वृषभ रूप में शिववाहन होकर भगवान शिव और देवी पार्वती को एक साथ अपने स्कन्ध पर धारण कर विश्व-पर्यटन किया। इसीलिए शिववाहन वृषभ 'नन्दीश्वर' कहकर परिचित है। वृषभ या ऋषभ शब्द का अर्थ हुआ श्रेष्ठ एवं बलिष्ठ। अतएव 'नन्दी' अति शक्तिशाली श्रेष्ठ एक शिवसायुज्यवान ब्रह्मर्षि जिन्होंने आयोनिसम्भवा 'हनुमान' रूप में अवतार धारण कर देवी सीता का संकट मोचन किया था इसीलिए उनका नाम पड़ा 'संकट मोचन'।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (२)

ॐ

८ अग्रहायण, १३४५

काशीधाम

श्रीमाती सरला परम् कल्याणीयाषु,

तुमने विदेह-मुक्ति किसे कहते है, जिज्ञासा किया था। 'विदेह' शब्द का तात्पर्य है विगत देह। देह कायम रहते जो मुक्ति होती है उसकी, काया त्याग के पश्चात् मुक्ति से और भी उत्कर्षावस्था होती है। जब तक कलेवर का अस्तित्व रहता है पूर्व जन्माकृत प्रारक कर्मफलों का भोग होता है। मृत्यु के पश्चात् और कर्म भोग नहीं रहता। वही है विदेह मुक्ति। उसी को निर्वाण मुक्ति या कैवल्य मुक्ति भी कहते है। जीव तब ब्रह्म में सम्पूर्णरूपेण स्थित होकर उस में एकाकार हो जाता है, एवं सम्पूर्ण विश्राम, आनन्द और शान्ति चिरकाल पर्यन्त भोग होती है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देह रहते हुए उसके पूर्व-जन्मकृत जिन समस्त कर्मों का भोग नहीं होता, वे समस्त आत्मज्ञान के द्वारा दग्ध होकर नष्ट हो जाते है। जो सब पूर्वजन्म में प्रस्फूटित होकर फलोन्मुख हुए, वे इस जन्म के हेतु होते हैं एवं मात्र वे ही कर्मों के फल इस देह को भोगने पड़ते है। उस भोग के लिए एक आयु भी प्राप्त होती है। प्रारब्ध शब्द का अर्थ – जो फल देना आरंभ कर फल भोग के लिए जन्म और आयु प्राप्त होती है एवं उस जीवन में उन समस्त कर्म मात्र का फल भोग होता है। अन्यान्य कर्मों का फल इस जीवन में भोग नहीं करना पड़ता। वे सभी अभूक्त कर्मों के बीज ज्ञान द्वारा नष्ट नहीं होते। मृत्युकाल पर्यन्त भोग होकर उनका अन्त होता है। इस प्रकार ज्ञानी का और कोई कर्म नहीं रहता। वे बैकुण्ठधाम, गोलोक धाम या ब्रह्मलोक इत्यादि किसी लोक में भी गमन नहीं करते। सर्वव्यापी परमात्मा में ही देहांतर में उनका मन, इन्द्रियादि विलीन हो जाते है। प्रारंभ में द्वैत भाव में साधन होता है। पश्चात् में चित्त निर्मल होने पर अद्वैत भाव का विकास होता है। उसी क्रमिक विकास में – 'मैं वही अनन्त ब्रह्म' ऐसे ज्ञान का उदय होता है। क्रमशः साधन करते-करते, सर्वदा सर्वत्र बगैर प्रयास स्वयं को सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में जान पाते है तब यह भाव ही स्वाभाविक हो जाता हैं। यही है जीव-मुक्ति। यह अवस्था प्राप्त होने से मृत्यु के पश्चात् निश्चय ही निर्वाणमुक्ति लब्ध होगी। तुमलोग मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो एवं सदा साधन करो, जीवनमुक्ति हो जाएगी। इति–

श्रीकिशोरी मोहन

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(११)

चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनम्।
बिन्दुनाद-कलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः।।३९

–चैतन्यं, शाश्वतं, शान्तं, व्योमातीतं, निरंजनं, बिन्दुनादकलातीतं यत् ब्रह्म, स एव गुरः तस्मै श्रीगुरवे नमः।।३९

–वे चैतन्य स्वरूप हैं (प्रमाण प्रत्यक्षरूप में समझा जाता है कि वह चेतनाहीन जड़वस्तु की तरह नहीं है; अर्थात् उसके साथ रहने से चैतन्य की वृद्धि होती है, परन्तु जड़संग में रहने से चैतन्य का ह्रास होता है, यह प्रत्यक्षीभूत होता है; वह शाश्वत पुरुष (अर्थात् वे ही एकमात्र नित्यपुरुष है, परन्तु जड़वस्तु समूह उनमें समाकर लयप्राप्त होते है इसलिए वे सब अनित्य है (उनके निकट जाते ही यह मालुम हो जाता है); वे शांत है, (अर्थात् उत्पत्ति और नाश के अधीन होने पर जड़वस्तु अशान्त है, उत्पत्ति के पश्चात् निम्नगति प्राप्त होकर वृद्धत्व प्राप्ति कर क्रमशः नाश की ओर धावित होने के लिए गतिशील अवस्था में अवस्थान कर रही है; अतएव वह शांत कैसे हो सकती है? परन्तु ब्रह्म की उत्पत्ति व लय नहीं है अतएव वे सदा ही शान्त है); वह व्योमातीत है (अर्थात् व्योमतत्त्व पर्यन्त जड़ की गति है, उस पद का अतिक्रमण करते हुए निरंजन पद पर आने से, जड़ के जड़त्व का पतन होकर वह सूक्ष्मब्रह्म में मिल जाता है, अतएव निरंजन पद के साथ जड़ का कोई सम्पर्क नहीं है, अतएव जितने क्षण चिन्ता (जो जड़विषय के सम्पर्क में होती है) रहती है उतने क्षण समझना होगा कि जड़-सम्बंध लयप्राप्त करवाकर जीव निरंजन पदपर स्थित हो नहीं पाया; वह निरंजन पुरुष है (जहाँ अंजनरूप अर्थात् विषय संस्कार रूपी मल नहीं है, वह ही निरंजन का रूप है); वह बिन्दुनाद कलातीत है (जितने क्षण जीव निम्न जगत् में रहता है, उतने क्षण अतिसूक्ष्म है इसलिए बिन्दुरूप में उसका दर्शन होता है; उसमें जा पहुँचने से जीव का आत्मविसर्जन होता है। तब ब्रह्म निर्देशक बिन्दु भी नहीं है एवं आत्मविसर्जन हेतु परकीय आत्मसत्ता भी नहीं है); उसमें जाने के लिए गतिशील अवस्था में नादरूपी शब्द श्रुतिगोचर होता है; वहाँ पहुंचने पर और गति नहीं रहती; अतएव नाद भी नहीं है। सम्पूर्ण वस्तुऐं ही ह्रास-वृद्धि के अधीन है, उनकी ह्रास-वृद्धि नहीं है, अतएव वह कलातीत है। ऐसे गुरु को नमस्कार।।३९

स्थावरं निर्मलं शान्तं जंगमं स्थिरमेव च।
व्याप्तं येन जगत् सर्व्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः।।४०

–शांतं तत्ब्रह्म स्थावरं (स्थावर रूपेण स्थितं; निर्म्मलं (मलशून्य भावेन स्थितं); जंगमं (जंगम रूपेण स्थितं); स्थिरं (गतिशून्य भावेन स्थितं); येन (तादृशपुरुषेण) सर्व्वं जगत् व्याप्तं, तस्मै श्रीगुरवे नमः (सर्व्वं ब्रह्ममयं जगतित्येवं प्रकाशयति)४०।।

वह शांतब्रह्म इस जगत् में स्थावर रूप में, मलशून्यभाव में व स्थिरभाव में रह रहा है, एतादृश अवस्था सम्पन्न पुरुष सर्वजगत् में परिव्याप्त होकर अवस्थान कर रहा है, तादृश गुरु को नमस्कार।।४०

यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम् ।
स एव सर्व्वसम्पन्नः तस्मै श्रीगुरवे नमः।।४१

–यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानं स्वयम् उत्पद्यते, स एव सर्व्वसम्पन्नः (गुरुः) तस्मै श्रीगुरवे नमः।।४१

–जीव जगत् में अपनी आत्मसत्ता को खो बैठे है एवं परसत्ता को आत्मसत्ता बोध करते हुए दर्शन कर रहे है । देह अवलम्बन कर वे आए हैं, अतएव सोच रहे हैं कि मानों देह ही है उनके उत्पत्ति का कारण एवं आत्मसत्ता, अतः वह देहवादी है; इसीलिए देह के नाश से उसका भी नाश होगा, यह वह समझता है। अतएव देह रक्षार्थ उसका अधिक यत्न होता रहता है। इसलिए वे ज्ञानप्राप्ति की चेष्टा करता है अर्थात् किस उपाय अवलम्बन करने से वह अपने देह की रक्षा कर पाए एवं किस प्रकार वह देहजनित सुखोपभोग में तृप्त रह सके, इस समस्त विषय के ज्ञान के लिए वह सदा ही व्यस्त रहता है। परन्तु देह नश्वर वस्तु है एवं किसी भी उपाय से उसको अविनश्वर किया नहीं जा सकता, एवंविध धारणा कदापि किसी बुद्धिमान को होती है, वे समझते है कि देहजनित सुखोपभोग परिशेष में दुःख का ही कारण होते हैं; अतएव वे अनुभव करते है कि देह उनके उत्पत्ति या सुख

का कारण हो नहीं सकती, इस कारण वे अपने उत्पत्ति के कारण के अनुसन्धान में वहिर्गत होते है। वे सद्गुरु के निकट आते है, गुरु जीव के अन्तरस्थित आत्मसत्ता से परिचय करवा देते हैं; तब वे देखते है कि प्रत्यक्षदृष्ट कूटस्थ ब्रह्म ही उनके उत्पत्ति का कारण है, तद्ध्यान में रहने से ही सर्वप्रकार का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ।।४१ *...क्रमशः*

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

पुराण कथा

मरुत-गणों की कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

रामायण में वर्णित है, ब्रह्मापुत्र मरीचि से कश्यप प्रजापति ने जन्मग्रहण किया। उन्होंने दक्ष की ६६ कन्यायों में अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला नाम की आठ कन्याओं से विवाह किया। कश्यप एक ऋग्वेद के मंत्रद्रष्टा ऋषि भी थे। दक्षकन्या दिति भगिनी अदिति के महातेजशाली पुत्र इन्द्र को देखकर अपने पति कश्यप से वैसे ही वीर्यशाली एक पुत्र के लिए प्रार्थना की। पुत्र के लिए प्रार्थना करने पर कश्यप ने प्रचुर अर्थ व्यय कर एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया एवं ''इन्द्र शत्रो भवस्व'' कहते हुए अग्नि में घृताहुति दी। अतःपर उन्होंने दितिका गर्भधान कर उन्हें कहा, ''तुम शतवर्षों तक अतीव यत्न सहकार सर्वप्रकार अनाचार वर्जन करते हुए सम्पूर्ण शुचिभाव से इस गर्भ की रक्षा करना। तब तुम अपने अभिलषित पुत्र की प्राप्ति करोगी।'' यह कहकर कश्यप चले गये।

दिति भी स्वामी के निर्देशानुसार शुचिशुद्धभाव से अवस्थान करने लगी। इन्द्र को जब यह ज्ञात हुआ तो उस गर्भ को नष्ट करने के लिए वे दिति के निकट गए एवं उसके मन में छल-बल से विश्वास जगाकर गर्भ नष्ट करने के सुअवसर की प्रत्याशा में वहाँ अवस्थान करने लगे। शत्वर्ष पूर्ण होने में जब तीन दिन बाकी थे तब एक दिन दिति अप्रमादवशतः अधौतपाँव से मुक्तकेश कर दिन में निद्रित हो गई। इन्द्र ने दिति के उस अशुचि भाव को जानते हुए परिस्थिति का सुयोग पाकर दिति के उदर में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट कर उस गर्भ को सर्व प्रथम सप्त खण्ड में छेदन किया। किन्तु वज्रछिन्न होने के उपरांत भी वह गर्भ क्रन्दन करने लगा। तब इन्द्र ने उन्हें 'मा रुद' कहते-कहते प्रत्येक अंश को पुनः सप्त खण्ड में विभक्त किया। इस प्रकार उनचास खण्ड में विभक्त होने के पश्चात् भी वह गर्भ रोदन करने लगे। इससे इन्द्र अतिशय शंकित हो पड़े एवं ब्रह्मा की पूजा के फलस्वरूप दिति का वह गर्भ वज्राहत होने के पश्चात् भी विनष्ट नहीं हुआ यह समझने के उपरांत दिति से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, ''मातः! मैंने हिंसावश आपके गर्भ का विनाश करने की चेष्टा की। लेकिन अब यह प्रत्यक्ष किया कि ब्रह्मा से वर प्राप्त होकर वे सर्वथा अवध्य है। इनके रोदन के समय मैंने इन्हें 'मा रुद' कहा था। इसीलिए ये लोग 'मरुत्' नाम से ख्यात सुखभागी देवता होंगे। मैंने आपकी इन संतानों को 'मरुद्गण' का नाम देकर देवगणों के समान कर लेता हूँ। यह कहते हुए इन्द्र मरुद्गणों को निज विमान में आरोहण कर स्वर्ग ले गये। तब से मरुद्गण यज्ञभागभोजी होकर देवताओं के अन्तर्भुक्त हुए।

भागवत में उल्लेखित है, इन्द्र जब दिति के उदर में प्रवेश कर गर्भ को छिन्न कर रहे थे, तब छिन्नमान खण्डांश एक-एक पूर्णांग बालक के सदृश रोदन करते-करते कहने लगा, ''हे इन्द्र, हमलोग तुम्हारे भ्राता है, तुम हम लोगों का वध करने के इच्छुक क्यों हो।'' तब विस्मित होते हुए इन्द्र ने प्रकृत सत्य को समझा एवं उनसे कहा, ''भीत मत होवो। तुमलोग मेरे भ्राता हो। तुमलोगों को मैं अपना पार्षद बना लूँगा।'' इन्द्र के वज्र से आहत होने के उपरांत भी उनचास भाग में विभक्त गर्भ विनष्ट नहीं हुआ वरन् प्रत्येक अंश पूर्णांग बालक होकर गर्भ से निष्क्रांत हुआ। दिति निद्रा से उत्थित होकर अग्नि के सदृश प्रभा सम्पन्न उन उनचास पिण्डों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई एवं समीपस्थ इन्द्र को देखते हुए उनसे उन बालकों का परिचय जिज्ञासा किया। इन्द्र ने तब दिति को समग्र वृतांत सुनाकर क्षमा याचना की। दिति ने तब कहा, ''मेरे ही कर्म दोष से मेरा गर्भ विफल हुआ है, उसके लिए मैं तुम्हें शाप नहीं दूँगी। लेकिन तुम मेरी सन्तानों के लिए मंगल विधान करो। मेरे पुत्रों के लिए नभमण्डल में वातस्कन्ध नामक सात स्थान कल्पित हो। वे यथाक्रम से आवह नामक पृथ्वीस्थ प्रथम स्कन्ध, प्रवह नामक मेध से सूर्यमण्डल पर्यन्त विस्तृत द्वितीय स्कन्ध,

उद्वह नामक सूर्य के ऊर्ध्व में चन्द्रमण्डल पर्यन्त विस्तृत तृतीय स्कन्ध, सुवह नामक चन्द्र से नक्षत्रमण्डल पर्यन्त विस्तृत चतुर्थ स्कन्ध, विवह नामक ग्रहमण्डल पर्यन्त विस्तृत पंचम स्कन्ध; परावह नामक सप्तर्षि मण्डलावधि षष्ठ स्कन्ध, परिवह नामक सप्तर्षि मण्डल से ध्रुव नक्षत्र पर्यन्त विस्तृत वायुस्कन्ध में विचरण करे। तुम्हारे ही कर्मों के फलस्वरूप वे 'मरुत्' नाम से कथित हो'' इन्द्र ने कहा, ''आप की प्रार्थना पूर्ण होगी। तदुपरांत आपकी सभी सन्तान देव सदृश होकर देवगणों सहित यज्ञभागभोजी होगी।'' इसीलिए मरुत्गण दिति पुत्र होते हुए भी देवत्व और अमरत्व को प्राप्त हुए। इन्द्र ने मरुत्गणों को सातगणों में विभक्त किया। विभिन्न पुराणों में सातगणों के अन्तर्गत मरुत्गणों का नाम भिन्न भिन्न देखा जाता है। यहाँ वायु पुराण के मतानुसार मरुत्गणों के नाम दिये गये है। यथा – सत्त्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यगज्योति, सज्योति, ज्योतिस्नान और हारित, ये सभी प्रथम गण के अन्तर्भुक्त है। ऋतजित्, सत्यजित्, सूषेण, सेनजित्, सत्यमित्र, अभिमित्र और हरिमित्र, ये द्वितीय गण है। इस प्रकार निम्नलिखित अन्यान्य मरुत्गण प्रति सात मिलकर एक गण है। उनके नाम यथाक्रम से है – कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईदृक्, अन्यादृक्, यादृक्, प्रतिकृत्, ऋक्, समिति, संरम्भ, ईदृक्ष, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस्, समिता, समिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुः, अनुदृक्, साम, मानुष और विश।

स्कन्द पुराण के नागखण्ड में वर्णित है कि देवासुर संग्राम में इन्द्र द्वारा दैत्यगणों (दिति तनयों) का वध करने पर दिति ने शोकाकुल होकर सहस्र वर्षों तक शक्र-समुद्भव तीर्थ पर तपस्या की। उनकी तपस्या से सन्तुष्ट होकर महेश्वर ने उन्हें वर प्रार्थना करने के लिए कहा। तब दिति ने उनसे देव-दर्पनाशन, यज्ञभागभोगी बलवान पुत्र के लिए प्रार्थना की। महेश्वर के उन्हें वरदान देने के पश्चात् दिति ने कश्यप के औरस से पुनः गर्भधारण किया, जिसके फलस्वरूप 'मरुद्गणों' का जन्म हुआ।

यौगिक व्याख्या – 'मरीचि' (म + इचि) शब्द का अर्थ (ब्रह्म) 'प्रकाश की किरण' अथवा 'प्रकाश का कण' अर्थात् ब्रह्माणु। 'कश्यप' (कश्य + पा + क) अर्थात् 'कश्य' का अर्थ सुदृढ़; जो सब प्रकार की अवस्थाओं में दृढ़ता प्राप्त है वे ही 'कश्यप' पदवाच्य है। 'अदिति' (दो + क्तिन्) अर्थात्, पृथ्वी एवं वाणी, अर्थात् वाणीरूपा नादध्वनि से पृथ्वी की सृष्टि हुई है। नादध्वनि ज्योतिर्मय शब्द विशेष; अतएव नादालोक से सृष्टि में देवताओं का सृजन हुआ। इसीलिए 'अदिति' हुई नादमयी शक्ति की प्रतिमूर्ति। अतएव 'अदिति' सत्त्वगुणात्मक शक्ति। 'दिति' (दो + क्तिन्) अर्थ से विभक्त करना एवं उदारता का बोध होता है। जिन्होंने उदार चित्त से सृष्टि मध्य प्रकृति के सर्वक्षेत्र में निज को विभक्त कर लिया एवं विलीन कर दिया, वे हुई 'दिति'। अतएव 'दिति' रजोगुणात्मक शक्ति। मरुत् (मृ + उति) अर्थात् 'मरुत्' शब्द का अर्थ वायु। वायु के देवताओं के समूह को मरुत्गण बोला जाता है।

'मरीचि'रूपी स्वप्रकाश ब्रह्म की किरण स्वरूप ब्रह्म कण से विशुद्ध सत्ता सुदृढ़ आधार सम्पन्न 'कश्यप' उद्भूत हुए। कश्यप की प्रथम स्त्री विशुद्ध सत्त्वगुण प्रधान पृथ्वी रूपी आधार सम्पन्न नादमयी शक्ति की वाणीरूपी प्रतिमूर्ति 'अदिति' से सृष्टि के वक्ष पर देवताओं ने जन्म ग्रहण किया। कश्यप की अन्य स्त्री विशुद्ध रजोगुण प्रधान उदार स्वभाव विभाजन शक्ति से जन्मग्रहण किया दानवों ने एवं दैत्यों और विविध श्रेणियों के प्राणियों ने इस ब्रह्माण्ड के सर्वलोकों में सर्वस्तर के सर्वक्षेत्रों में।

देवताओं में श्रेष्ठ अदिति के पुत्र वीर्यशाली इन्द्र अर्थात् हमारे देहाभ्यंतरस्थ सर्वेन्द्रियों के अधिपति है ये 'इन्द्र', और विद्या-अविद्या रूपी देवासुर संग्राम में इन्द्ररूपी मन या चित्त आत्मसारूप्य में अवस्थान करते हुए विशोका ज्योति के प्रज्ञा के प्रभाव से रजोगुणात्मक दानव और दैत्य सदृश रिपुओं का दमन और वध करते एवं स्वर्ग के अधिपति देवराज रूप में परिगण्य और मान्य हुए सम्पूर्ण निखिल विश्व में। इससे दितिरूपी माता का हृदय विदीर्ण हुआ मायिक शोक से। अर्थात् देहाभ्यंतर में रिपुगण, इन्द्रियगण के प्रथमावस्था में जब शमित और दमित हो जाने पर एक उदार हताशा का भाव चित्त में उत्थित होता है एवं प्रज्ञालोक के प्रकाश में उस शोक के अपसारित होने पर पुनः और भी गभीर उपलब्धि के लिए तपस्या करने की इच्छा मन में जाग्रत होती है । तब साधक हृदय में शुरु होती है पूर्णता प्राप्ति के लिए सचेष्ट होने की आकांक्षा। इसलिए इन्द्र को भी जय करना होगा ध्यान एवं समाधि के माध्यम से। उदार मनोभाव लेकर प्रज्ञालोक में जब सब के मध्य ही साधक अपने को प्रकीर्णित कर सकता है एवं तब उपलब्धि करता है कि प्रति प्राणी के मध्य ही उस आत्मबिन्दुरूपी ब्रह्मकण का प्रकाश है। यह अवस्था प्रगाढ़ होने पर शिवरूपी आत्मगुरु की कृपा

से तब महादेव दिति को वरदान देते है कि देवदर्प-विनाशन यज्ञभागभोक्ता बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अर्थात् क्षिति, अप, तेज, मरुत्, व्योम और मन, ये षष्ठ प्रकृति जयी बलशाली वायुरूपी तेजसम्पन्न मरुत्देवगण समुद्भूत हुए दिति के गर्भ से। इन्द्ररूपी मन उन्हें वध करना चाहते हुए भी कर ना पाए क्योंकि वे कश्यप द्वारा कृत यज्ञ में ब्रह्मा से वर प्राप्त कर अवध्य थे। अर्थात्, इन्द्र हुए देवता किन्तु प्राणवायु हुई परासम्वित का स्पन्दन मिश्रित वायवीय आकार विशेष जो 'देव' अंश सम्भूत है; इसीलिए मरुत्गण देव होने से अवध्य थे, वे ईश्वरकोटी के जीव थे, इसक्षेत्र में इन्द्रदेवता होने पर भी कार्यत: उनकी गति जीवकोटी के मध्य ही आबद्ध थी। अतएव प्रथम में इन्द्र द्वारा सप्तभाग में विभक्त होकर एवं उसके पश्चात् एक-एक अंश सप्तधारा में विभक्त होकर उनचास (४९) वायुरूप में प्रधान उनचास नाड़ियों के मध्य में वायुशक्तिरूप में प्रवाहित हुई मानव शरीर में; इस प्रकार ४९ नाड़ियाँ उत्सारित हुई नाभिपद्म से एवं समग्र देह की कार्यकारिता के लिए मरुत्गण रूप में विस्तृति लाभ की। ये समस्त 'मरुत्गण' हुए हमारे देहाभ्यंतरस्थ ४९ नाड़ियों मध्य वायुरूपी देवता या ईश्वर। यही मरुद्गण हुए सुषुम्ना के अन्तर्गत नाड़ी समूहादि।

इन ४९ मरुत्गणों का आवासस्थल सप्त वातस्कन्ध में अर्थात् विभिन्न स्तर के आकाश मण्डल में इस ब्रह्माण्ड के वायवीय स्तर में है, जिन्हें 'मरुत्लोक' कहकर उल्लेख किया गया है। इन सात वातस्कन्धों में प्रथम आवह, नाभि से नीचे पृथ्वीमण्डल के आकाश में अवस्थान करता है, अर्थात् नाभिमण्डल से कुछ नाड़ी निम्न में मूलाधार पर्यन्त अवतरित हुई है एवं पश्चात् में स्वाधिष्ठान चक्र में जैसे, द्वितीय वातस्कन्ध प्रवह, भूवर्लोक या द्युलोक से अर्थात् स्वाधिष्ठान के पुन: ऊर्ध्व में नाभि में मणिपुर सूर्यमण्डल पर्यन्त आरोहित होकर विस्तृत है। यहाँ वायु की जो क्रीड़ा होती है वह ब्रह्मदेवरूपी ब्रह्मा को अर्पण की जाती है। और मूलाधार में प्राण-अपान का प्राणयज्ञ शुरु होता है। तृतीय वातस्कन्ध उद्वह सूर्य या तेज मण्डल से आरम्भ ऊर्ध्व में चन्द्रमण्डल पर्यन्त विस्तृत एवं इसी प्रकार नाभि से नाड़ी समूहादि के विभिन्न स्तरों में गमन किया है और चन्द्रमण्डल पर्यन्त विस्तृत वातस्कन्ध तन्मध्य वायवीय स्तर में 'मरुत्लोक' उद्भासित हुआ है जो है मरुत्देवगणों की आवासभूमि। अर्थात् नाड़ी समूहादि विशुद्धचक्र अतिक्रम कर आज्ञा के पथपर मस्तकग्रंथि या ललना चक्र में आकर एकत्र होकर ग्रथित हुई है। उनमें से कोई-कोई विशेष नाड़ी आज्ञा अतिक्रम कर और भी ऊपर सहस्त्रार पर्यन्त अरोहित हुई है। ललनाचक्र के ४९ दल ही ४९ मरुत–गणों के कर्म के केन्द्र या दरबार अथवा सिंहासन। यहीं से है मन की विस्तृति। ये ललना चक्र स्थल में सोममण्डल और सप्तर्षि मण्डल से ध्रुव नक्षत्र पर्यन्त व्यापृत है। कूटस्थ में सुषुम्ना मध्यस्थित ब्रह्मनाड़ी रूपी ब्रह्मबिन्दु ही है ध्रुवपद या ध्रुवनक्षत्र। अर्थात् व्योमतत्त्व के व्यापृति में मन की अन्तिम सीमा के बाद चित्त में ध्रुवपद पर्यन्त जो साधक योगी अपनी चेतना को विस्तृत करने में सक्षम है, वे सम्बोधि प्राप्त योगी होते है।

ऋक्वेद में भी मरुत्गणों का उल्लेख मिलता है। ऋक्वेद में भी मरुत्गणों की संख्या सात है। यह संख्या उल्लेख के समय सप्तम में सप्त अर्थात् सात-सात जन मरुत् का उल्लेख रहने से पुराण में (४९) उनचास मरुत् हुए है। फिर ऋक् वेद के एक स्थल में ६३ जन मरुतों का उल्लेख मिलता है। मरुत्गण ऋक्वेद के अन्यतम प्रधान देवता। वे ३३ सूक्तों में स्तुत हुए हैं। अन्य देवता इन्द्र, अग्नि और पूषा के साथ और भी नौ सूक्तों में उनकी स्तुति है। मरुत्गणों के माता-पिता रुद्र और पृश्नि (सम्भवत: विचित्रवर्ण मेघ) पृथ्वी और समुद्र के एक रुद्र के पुत्र होने के कारण ये 'रुद्र' नाम से अभिहित होते है। ये सभी समवयस्क हैं एवं ये लोग देवी रोदसी (रोदसी का अर्थ है आकाश, विद्युत्) के विद्युत्मय रथ में वहन करते है। रोदसी मरुत्गणों की स्त्री है। मरुत्गण इन्द्रपत्नी इन्द्राणी के सहायक और बन्धु एवं सरस्वती के सखा। ये लोग वसुगणों के सहित एक रथ पर भ्रमण करते है।

मरुत्गणों की उज्ज्वल ज्योतिर्मय, विद्युत् विजड़ित देह, इसके पिता रुद्र के सदृश तथा इनके हस्त में कुठार और धनुषवाण रहते है। इनके वृषभ के सदृश गर्जन करने से पृथ्वी कम्पित हो जाती है, वृक्ष उत्पाटित् हो जाते हैं और वन विमर्दित हो जाते है। मरुत्गण का प्रधान कार्य सूर्य के चक्षुओं को आवृत कर रखना। मरुत्गण इन्द्र के सखा और अनुचर है। ये संगीत और स्तुति द्वारा इन्द्र के बल की वृद्धि करते है। इन्द्र अपने समस्त कार्य इन मरुतगणों की सहायता से सम्पन्न करते है।

(विभिन्न पुराणादि से संग्रहित)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

योग व्याख्या – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ३२ : योगी का परिचय क्या है? योग साधना करके किस प्रकार समझा जा सकता है कि 'योग सम्यक सिद्ध हुए है? साधारण लोग योगी को पहचानेंगे कैसे?

उत्तर : प्रकृत योगी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते है। जो असम्भव को सम्भव कर सकते हैं वे ही प्रकृत योगी होते हैं।

एक उच्चकोटी के सूफी महात्मा (अब्दूल कादिर जिलानी) से कहा गया – ''जल के मध्य अग्नि का संयोग कीजिए।'' उन्होंने जल के भीतर अग्नि प्रज्ज्वलित कर प्रत्यक्ष करा दिया। योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। योगी मनुष्य नहीं वरन् ईश्वर होते है। कारण सर्वज्ञत्व और सर्व शक्तिमत्ता ईश्वर का धर्म होता है, मनुष्य का धर्म नहीं। असम्भव को सम्भव करना भी माया के अन्तर्गत है; माया ईश्वर के अधीन शक्ति विशेष है।

ईश्वरत्व का अर्थ है ऐश्वर्य का विकास; ऐसा ना होने पर मनुष्य कदापि योगी पदवाच्य का अधिकारी नहीं होगा। ईश्वर ही योगी और योगी ही ईश्वर। आत्मा का स्वाभाविक ऐश्वर्य अविद्या के आवरण से आवृत हो पड़ता है इसीलिए चित्त दर्पण में कामना-वासना की तरंगे निरंतर उत्थित होती रहती है। योगबल से कूटस्थ के मध्य हिरण्मय पुरुष के आविर्भाव होने से अज्ञान अपसारित हो जाता है। अज्ञान अपसारित हो जाने से प्रज्ञा के आलोक से जो दर्शन होता है वह नित्य और ध्रुव सत्य होता है। योगबल से ज्ञान का संचार होने से आत्मा के नित्यैश्वर्य का विकास होता है; उसे ही योगैश्वर्य कहा जाता है।

महात्माओं के सान्निध्य में सत्संग के माध्यम से योगी के योगीजनचित स्वभाव और आचरण देखकर साधारण लोग योगी को पहचान पाते है। योगीजन सर्वदा अपनी स्वमहिमा में ही विराज करते है। सामान्यत: वे अपने योगैश्वर्य को प्रकाशित नहीं करते; शुद्ध भक्त या भक्तों के समीप अनेक समय उनका योगैश्वर्य सहज सरल भाव में प्रकाशित हो पड़ता है। योगीगण अनुभवगम्य श्रद्धा के पात्र होते है। योगी लोग सिद्धाई नहीं होते। छोटे-मोटे भौतिक सिद्धियों को योगैश्वर्य नहीं कहा जाता। योगीगण ब्रह्मस्वरूप होते है। जो योगी होते है वे ब्रह्मविद् होते है; इसीलिए शास्त्र में उल्लेखित है -''ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति'' - अर्थात् जो ब्रह्मवित् है, वे ब्रह्मस्वरूप हो जाते है।

प्रश्न ३३: क्रिया करने का झुकाव या इच्छा किस प्रकार जगायी जाती है?

उत्तर : निज अन्तर में सत्चिन्ता द्वारा स्वयं ही अपने को अनुप्राणित कर पाए इस प्रकार नशा लगाना होगा। संसार में मायाबद्ध जीव माया में आच्छन्न रहता है। सामने जो देख नहीं पाते, वे उस वस्तुप्राप्ति की चेष्टा नहीं करते। संसार के जागतिक कर्मबंधन के घात-प्रतिघात से संघर्ष के फलस्वरूप प्रारब्ध अनुयायी सुख-दु:ख को भोग करते-करते एकदिन मानसिक क्लान्ति अवश्य ही घेर लेती है। तब सद्गुरु के पास अथवा किसी महात्मा के सान्निध्य में जाकर वे उस क्लान्ति को विदूरित करते है। सत्संग से मानसिक प्रशान्ति मिलती है क्योंकि जो प्रकृत सद्गुरु है, वे अपनी अखण्ड ज्योति की प्रभा से अलक्ष्य में ही जीव की मलिनता, कलुषता धौत कर देते है। अतएव प्रकृत सद्गुरु के सान्निध्य या सुउन्नत महात्मा अथवा सिद्ध-पुरुष के सान्निध्य में मनुष्य के मन में चित्त-तरंग के अणुपरमाणु परिवर्तित हो जाते है। तब अन्तर में स्वत: प्रेरणा जाग्रत होती है एवं साधन करने के लिए मन में उत्साह बढ़ता है। लेकिन यह अस्थायी घटना है। इस स्थिति को स्थायी करने के लिए नियम से गुरुसान्निध्य में सत्संग करना पड़ता है। ईश्वर भावना से ईश्वर दर्शन और अनुभूति होती है। भावना के तारतम्य में अनुभूति उपलब्धि का भी तारतम्य होता है; वहीं से जाग्रत होती है क्रियायोगरूपी ब्रह्मविद्या साधन का झुकाव या इच्छा। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि तमोगुण और रजोगुण, इन दोनों को प्रश्रय देने से साधक का पतन अवश्यम्भावी है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीश्री सर्वाणीमाँ को विशेष अनुरोध, वे यदि ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्रके साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर आलोकपात एवं व्याख्या हिरण्यगर्भ पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित करे तो यह एक अमूल्य सम्पद हो जाएगी। परवर्तीकाल में इसे एक पुस्तक का रूप दिया जा सकता है।

–विजन कुमार सेनगुप्त

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगुढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

१। पत्र (२) - ''श्रीश्रीगुरुदेव आपको (अक्षय दत्तगुप्त को) कुछ योग-सिद्धि के पथ हेतु कार्य देंगे।'' यह योग-सिद्धि का पथ क्या है?

आत्मज्ञान अर्थात् स्वरूप उपलब्धि प्रत्यक्ष भाव से करने के लिए सहस्रार के ऊपरि व्योम-मण्डल में जो भर्गज्योतिरूप सौरमण्डल अवस्थित है, उसी सौरमण्डल का आश्रय ग्रहण अर्थात् सौरतत्त्व के ज्ञान को अवलम्बन कर करना होगा। सहस्रार के ऊपरिभाग में परम व्योम स्थित सौरमण्डल से जिन रश्मियों ने अवतरण कर देहाभ्यन्तरस्थ नाड़ी जाल का सृजन किया है एवं सहस्रार में अक्षर बिन्दु समन्वय से ग्रथित सूर्य रश्मि निम्न में विभिन्न स्तर में अवलम्बन कर, विभिन्न स्तर के चक्रमध्य में ग्रथित हुई है अक्षर बिन्दु के समन्वय से - ऐसे सौररश्मि समन्वित नाड़ीज्ञान को ही योग-सिद्धि का पथ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हृदय प्रदेश एवं नाभि तथा ऊननाभि स्थल - ये कुछेक सौररश्मि समन्वित नाड़ियाँ चेतना के अन्यतम प्रधान केन्द्रस्थल है, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह को संचालित करते है।

'विज्ञान' शब्द का अर्थ 'विशिष्ट ज्ञान'। सृष्टि के वक्ष पर चैतन्य का दो रूपों में प्रकाश परिलक्षित होता है - यथा - जड़ और चेतन। उभय ही विज्ञान के विषय है। सूर्यरूपी प्राण इनके केन्द्र स्वरूप और प्रधान आश्रय है, इसीलिए इसे सूर्य विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का प्रकृत स्वरूप क्या है, किस प्रकार से अथवा उपाय से वह कार्यक्षेत्र में आयत्त करना पड़ता है, उसे जो विशेषभाव से अनुसंधान करते है, उन्हें 'योगविद्' कहा जाता है। जो यह ब्रह्मविज्ञान रूपी योग साधना करते है वे जानते है कि सूर्य ही सम्पूर्ण प्रकार के विज्ञान का मूल स्तम्भ है। सृष्टि, स्थिति और संहार - सभी सूर्याधीन है। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति का प्रसार सौरमण्डल से होता है। सिर्फ यही नहीं देहाभ्यंतरस्थ सभी नाड़ियों के मध्य वायुरूपी प्राण प्रवाह का कारण यह सौरशक्ति ही है। विशेष कौशल के प्राणायाम के फलस्वरूप देहाभ्यंतरस्थ विभिन्न नाड़ियों के मध्य विभिन्न प्रकार प्राणवायु की क्रीड़ा और कार्यकारिता जैसे-जैसे होती है, तब उन्हीं सब नाड़ियों के शुद्धिकरण से विभिन्न प्रकार के योगसिद्धि रूपी विभूति का प्रकाश योगी सत्ता में होता है। इन सभी योगसिद्धि के पथ पर चलने के लिए ब्रह्म-विज्ञान भित्तिक प्राणसाधना रूपी ब्रह्मविद्या का कौशल, या सद्गुरु वक्त्रगम्य साधन करना पड़ता है। ब्रह्मविद्या कौशल साधना ही हुई योगसिद्धि पथ का कार्य और 'योग सिद्धि का पथ' हुआ - ब्रह्मविद्या का कौशल साधन; ब्रह्मविद्या प्राणविद्या चिन्मय विशुद्ध विज्ञान तत्त्व साधन - जो हुआ सौरविज्ञान के अन्तर्गत। ड: गोपीनाथ कविराज महाशय ने कहा है - ''सूर्य विज्ञान आयत्त होने पर अन्यान्य विज्ञान - जो उनके ही अंगमात्र है - सहज ही आयत्त हो जाते है। योगशास्त्र में सर्वज्ञातृत्व एवं सर्वभावाधिष्ठातृत्व नामक विशिष्ट सिद्धि जैसे सर्वप्रकार खण्ड सिद्धि का चरम उत्कर्ष विज्ञान राज्य में सौरविज्ञान के तद्रूप प्राधान्य लक्षित होता है। चन्द्रविज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, वायु विज्ञान, स्वर विज्ञान, देव विज्ञान प्रभृति सभी सौर विज्ञान के अन्तर्गत खण्ड विज्ञान विशेष।'' – इस क्षेत्र में यह कहना उचित होगा कि नाड़ीविज्ञान समन्वय से आत्मज्ञानरूपी योग और विज्ञान हुआ एक अखण्ड महाविज्ञान का पर्याय अखण्ड ज्ञान संवलित योग-सिद्धि का परम पथ। योग के गतिपथ में १०८ प्रकार के पर्याय है ज्ञानपीठ के योग साधना में।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(१)

शिवरामपुर, अखण्ड महापीठ के पश्चिम में चहुँ-ओर रास्ते द्वारा वेष्टित, मध्य में प्राय: आठ कट्टा जमीन के ऊपर अवस्थित है, दक्षिण में भक्तनिवास एवं उत्तर में अन्नपूर्णाक्षेत्र। यह सब संभव हो सका हमारी श्रीश्रीमाँ की

हार्दिक इच्छा और दृढ़ संकल्प के द्वारा। अवतारकल्प उच्च कोटी के महात्माओं के मन की थाह पाना अत्यंत दुरूह है, जब तक कि अपनी इच्छा को वे स्वयं न प्रकट कर दे। उनके निर्देशानुसार वर्ष २००९ में शुभारम्भ हुआ यह कार्य आज अपनी पूर्णता के कगार पर है। वर्ष २०११ की न्यास-सभा में श्रीश्रीमाँ ने घोषणा कर सभी को अवगत करवाया कि दिसम्बर २०१२ में अन्नपूर्णा क्षेत्र का उद्‌बोधन होगा। इसके अतिरिक्त श्रीश्रीअन्नपूर्णा माँ के मन्दिर के ठीक ऊपर के गृह में श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजीऊ का श्रीविग्रह स्थापित होगा।

श्रीश्रीमाँ ने हमलोगों से कहा कि स्थायीभाव से भगवान श्रीनारायण के अधिवास के लिए जाग्रत पीठस्थान में जाकर श्रीनारायण देव को आमंत्रण देने का विशेष प्रचलन है एवं यह शास्त्रीय नियम भी है। प्रथा अनुयायी शालग्राम-शिला को लेकर श्रीनारायणक्षेत्र अर्थात् दुर्गमगिरि हिमालय के गोद में प्राचीन देवभूमि श्रीबद्रीनाथधाम में जाकर पूजा कर आना पड़ता है। समय जितना अग्रसर हो रहा था जाने की तैयारियाँ भी उतनी ही द्रुत गति से हो रही थी।

श्रीश्रीमाँ के साथ मेरे इस महापुण्य तीर्थ में जाने की अभिव्यक्ति प्रकट करने पर श्रीश्रीमाँ ने हामी भर ली, इसप्रकार श्रीश्रीमाँ को लेकर हमलोग पाँच तीर्थयात्री रवाना हुए। उनमें से हमलोग दो सन्यासी, मैं और स्वामी प्रबोधानन्दजी, एक ब्रह्मचारी डा: वरूण दत्त एवं अन्य गृहस्थ ड: पार्थ प्रतिम चक्रवर्त्ती, जिनकी धर्मपत्नी का जाना भी निश्चित् था, लेकिन शारिरीक अस्वस्थता के कारण वे जा न सकी। अत्यंत लंबा मार्ग, अत: समय के महत्व एवं श्रीश्रीमाँ के विश्राम की चिन्ता तथा यात्रा आरामदायक हो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए १७ सितम्बर २०१२ सोमवार, विश्वकर्मा पूजा के दिन हमलोग कलकत्ता से दिल्ली विमान द्वारा पहुँचे। दिल्ली से गुड़गाँव, वहाँ हमारे गुरुभाई नेहाल और बुबाई के गृह में कुछ देर विश्राम कर, उनकी आप्यायित सेवा ग्रहण कर वहाँ से गाड़ी से रवाना हुए शिवालय और हिमालय के प्रवेशद्वार हरिद्वार की ओर। अप्रतिम आनन्द के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। सद्‌गुरु (श्रीश्रीमाँ) के साथ गाड़ी में यह हमारी प्रथम यात्रा थी। चलती हुई गाड़ी से बाहर प्रकृति के अनुपम दृश्य मन को लुभानेवाले थे, उन्हें मैं मन में कैद करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में श्रीश्रीमाँ और गुरु भ्राताओं के मध्य विभिन्न तथ्यों पर वार्तालाप चल रहा था इसके साथ-साथ बीच-बीच में कुछ आध्यात्मिक उपदेश भी श्रीश्रीमाँ के मुखारबिन्द से नि:सृत हुए और बातों ही बातों में हिमालय की देवभूमि के संबंध में कुछ पौराणिक कथाएं इस तीर्थयात्रा के दौरान श्रीश्रीमाँ से सुन सका। इस तीर्थ यात्रा के दरमियान हमारे अभिभावक थे सद्‌गुरु श्रीश्रीमाँ एवं श्रीश्रीमाँ के क्रोड़ में उपविष्ट देवभूमि के दोनों देवता, यथा - श्रीदामोदर नारायण शिला और श्रीधर नारायण शिला। यही कारण था कि हमलोग माँ आद्याशक्ति के तरुछाया में अति आनन्द में और निरापद थे।

दिल्ली के लिए विमान के टिकिट काट लेने के पश्चात् ही हरिद्वार निवासी हमारे गुरुभाई सच्चिदानंदजी को बद्रीनाथ धाम में श्रीश्रीमाँ की तीर्थयात्रा पर जाने की आवश्यक जानकारी दी गई। उसी समय उन्हें हरिद्वार में रात्रिवास के लिए अच्छे और निरापद होटल की व्यवस्था करने को कहा गया तथा जहाँ आहार हेतु स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखा जाता हो। अगले दिन हरिद्वार और ऋषिकेश में परिचित कुछ आश्रम में श्रीश्रीमाँ हमलोगों को लेकर जाएगी एवं

तत्पश्चात् उसके अगले दिन १८ सितम्बर २०१२ भोरबेला में गाड़ी द्वारा श्रीश्रीमाँ रवाना होगी श्रीबद्रीनाथ धाम के उद्देश्य से। बद्रीनाथधाम में भी रात्रियापन के लिए एक अच्छे होटल का प्रबंध कर दिया गया यह सम्पूर्ण व्यवस्था सच्चिदानंदजी ने अग्रिम कर के रखी। दायित्वशील हमारे गुरुभाई सच्चिदानंदजी और उनकी स्त्री गीता भाभी ने सम्पूर्ण प्रबंधन कर हमें अवगत करवाया। इस प्रकार हमलोग व्यवस्था हेतु सभी चिंताओं से मुक्त थे केवल श्रीश्रीमाँ के साथ बद्रीनाथधाम में भ्रमण कर वहाँ की पवित्रता एवं धार्मिकता के अद्‌भुत महत्व का अवलोकन करना, मौन महिमायुक्त ध्यान में लीन तपस्वी पर्वतराज हिमालय की प्राकृतिक सुषमा, तुषारावृत गिरिश्रृंग की अपूर्वता, इस पार्वत्य उपत्यका से प्रवाहित होने वाली पतित पावनी गंगा, कृष्णप्यारी यमुना और ब्रह्मपुत्र की उद्‌गम-स्थली के अपरूप दृश्यों को एकबार नेत्रों में भर लेने की तीव्र आकांक्षा थी।

इस परम पवित्र स्थान के संबंध में धर्मग्रंथों में उल्लेखित है कि अक्षयधाम और मोक्षधाम के नाम से परिचित यह धर्मप्राण तीर्थ बद्रीनाथधाम यात्रियों के लिए हिमालय का अति पूण्यतम आकर्षणीय और स्मरणीय तीर्थस्थान है। यह तीर्थस्थान उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल जिले के दुर्गमगिरि हिमालय की गोद में, नीलकंठ पहाड़ के पूर्वदिक् में, नारायण पर्वत के पाददेश में, प्रवाहित पुण्यसलिला स्वर्गगंगा अलकनंदा के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। अपरूप सौन्दर्य वेष्टित और नर-नारायण पर्वत की स्मृति जड़ित प्राचीनतम इस हिन्दु तीर्थस्थान का विवरण धर्मग्रंथ महाभारत में उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त बदरिकाश्रम में पंचपाण्डवों ने छ:दिन व्यतीत किए थे। यह भी जाना जाता है कि यह धाम ऋषि शुकदेव, ब्रह्मर्षि नारद, भगवान श्रीकृष्ण और महाभारत रचयिता महामति व्यासदेव का साधन क्षेत्र रहा है। उसके भी बहुत पहले सती के देहत्याग के पश्चात् बदरिकाश्रम तीर्थ में आकर देवादिदेव महादेव ने स्वयं कठोर तपस्या की एवं भक्तकृपामय श्रीनारायण ने उनकी तपस्या से तुष्ट हो उन्हें वर प्रदान किया। विभिन्न ग्रंथों में यह तीर्थ भिन्न-भिन्न नामों से परिचित है। जैसे - बद्रीनाथधाम या बद्रीधाम, बदरिकाश्रम या बद्रीकाश्रम, बदरीनारायण या बदरीक्षेत्र, व्यासतीर्थ बदरीनारायण इत्यादि। व्यासदेव की साधनस्थली के कारण नामकरण हुआ व्यासतीर्थ एवं बदरी या बदर का अर्थ होता है बेर फल, इस स्थान पर अलकनंदा नदी के तीर पर स्वयं श्रीनारायण ने बेर-वृक्ष अर्थात् बदरी-वृक्ष के नीचे उपवेशित हो तपस्या की थी उसी समय से इस स्थान का नाम पड़ा बदरीनारायण।

कैलाशपति शिव का अधिष्ठान हिमालय पर सर्वत्र है किन्तु बद्रीनाथधाम क्षेत्र में महादेव विराजित नहीं है। इस तीर्थ के आराध्य देवता है स्वयं श्रीनारायण एवं इस महापुण्यक्षेत्र के मन्दिर में प्रतिष्ठित विष्णुमूर्ति चतुर्भुज है। उस मूर्ति का शिवावतार आदि शंकराचार्य ने वहाँ के नारदकुण्ड जल में उतरकर उद्धार किया था। उनके द्वारा पहली बार जल में डुबकी लगाने पर उन्हें खण्डित (दाएं हाथ की कुछ अंगुलियाँ खण्डित थी) काले पत्थर का चतुर्भुज नारायण विग्रह मिला। शंकरजी ने उसे अलकनन्दा के जल में विसर्जित कर दिया पुनराय कुण्ड के जल में डुबकी लगाने पर उसी के अनुरूप एक और विग्रह उन्हें मिला। यह घटना उनके लिए अत्यंत चिंताजनक थी। उन्होंने उस नारायण विग्रह को भी नदी में विसर्जित कर उस कुण्ड में तृतीयबार प्रवेश किया। इस बार भी जब जल से एक समान रूपवाला विग्रह उनके हाथों में आया तब, आचार्य शंकर के आश्चर्य का पार न रहा एवं वे सोचने पर मजबूर हुए कि इस अलौकिकत्व का कारण क्या है! यह क्या दैवी माया है? ठीक उसी समय उन्होंने दैववाणी सुनी कि कलियुग में यह भग्न विग्रह ही पूजित होगा। इस घटना के उपरांत ही उन्होंने शालग्राम शिला से निर्मित खण्डित प्राचीन विग्रह को मन्दिर में पुजारियों के मत से प्रतिष्ठित किया। आचार्य शंकर जब दैवादिष्ट होकर अपने धर्ममूलक कार्यों के उद्देश्य से शिष्यों के साथ बद्रीनाथ धाम में उपस्थित हुए तो मन्दिर के मध्य देखा कि शालग्राम शिला में बदरीविशालजी की पूजार्चना हो रही थी। चिन्तित आचार्य पूजारियों द्वारा बातचीत के माध्यम से जान पाए कि पाश्ववर्ती चीन देश के दस्यूओं के आक्रमण से श्रीविग्रह की रक्षा हेतु उन्हें गुप्त रूप से नारदकुण्ड में रखा गया किन्तु परवर्ती काल में अत्यंत कोशिशों के बावजूद पुजारी उन्हें पुनरुद्धार कर न सके। उसी परिप्रेक्ष्य में आदि शंकराचार्य के उपर्युक्त उल्लेखित शुभ पदक्षेप के फलस्वरूप कलियुग से आज तक चतुर्भूज में से भग्न द्विभूजयुक्त, जटाधारी तथा हृदय में भृगुपद चिह्नयुक्त श्रीनारायण, शान्त समाहित, पद्मासन में उपविष्ट साक्षात्

योगमूर्त विग्रह मन्दिर में नित्य पूजित हो रहा है। बदरी विशालजी का वर्तमान मन्दिर भी शंकराचार्य द्वारा निर्मित है एवं धर्मप्राणा महारानी अहल्याबाई द्वारा परवर्ती क्षेत्र में पुन:निर्मित हुआ मन्दिर का स्वर्णशिखर, वह भी धर्मग्रंथ से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति भी इसी महापुण्य तीर्थस्थान पर हुई थी।

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

परमब्रह्म के साक्षी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

(३२)

गतांक से आगे––

ऐसी अवस्था में उपनीत होकर साधक योगी परमशिव हो जाते हैं। मेरे अंतर में जब इस परासंवित का अवतरण

हुआ था, उस अवस्था के उपरांत मुझे और साधना नहीं करनी पड़ती, सब स्वचालित संपन्न होते, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही अवस्थाओं में साधना चलती थी ऐसा लगता था। इस अवस्था की उपलब्धि के पश्चात् 'गायत्री' मंत्र-रहस्य को गूढ़ रूप से समझ पायी थी। श्रीश्रीश्यामाचरण बाबा की पुस्तक में सिद्ध वासुदेव मंत्र का प्राधान्य है; किन्तु श्रीश्रीलाहिड़ी बाबा के शिष्य श्रीश्री प्रणवानन्द गिरि महाराज की सप्तश्लोकी प्रणव गीता पुस्तक में गायत्री मंत्र की उपयोगिता एवं प्रयोजनीयता का ज्ञानपूर्ण प्रसंग वर्णित है। मेरे जीवन में परासंवित के अवतरणोपरांत मस्तकस्थ मूलाग्रंथि अर्थात् रुद्रग्रंथि भेद न होने तक मैं गायत्री मंत्र का रहस्य हृदयंगम नहीं कर पायी थी। हृदयग्रंथि भेद होने के उपरांत सभी उन्नत क्रियावानों को गायत्री साधना का प्रयोजन है।

योगी जब परम शिवावस्था प्राप्त करते है तब वे हमेशा विराट् कूटस्थ में रूप दर्शन करते है, उस दर्शन के फलस्वरूप योगी मन के असीम परिधि के चैतन्य बोध के विशाल तत्त्व का अनुभव कर उसे हृदयंगम करने में सक्षम होते है। सर्वप्रथम रूप का दर्शन तत्पश्चात् अरूप का दर्शन और इनके बाद अनुभूति; चैतन्य से चेतना में वापस आने पर पुन: दर्शन प्रतिबिंबित होता है, तदुपरांत संबोधि अथवा महाबोधि की सहायता से स्वरूप की स्वानुभूति व्यक्त होती है। यही है श्रुति अवस्था; जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त परमशिव रूप योगी वज्राकृति अग्नि की झलक या (spark) कूटस्थ मध्य अवलोकित करते हैं एवं जिन-जिन विषयों पर वे इच्छा मात्र ध्यान केन्द्रित करते हैं तब प्रज्ञालोक में प्रदीप्त होकर उन विषयों के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में वे सक्षम होते है।

...क्रमश:

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

कृष्ण कथा

मुरु वध

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

मुरु नाम का एक भीषण राक्षस था। इसके सात हजार पुत्र थे। प्राक्ज्योतिष के राक्षस राज 'नरक' इनके मित्र थे। इस नरक राक्षस ने अपने बंधु मुरु की राजधानी की श्रीकृष्ण के आक्रमण से रक्षा करने के लिए मुरु की सहायता की थी। नरक ने अपने सहचर राक्षस के प्रदेश की सीमा को तलवार के सदृश रस्सी से घेरकर रखा था; किन्तु श्रीकृष्ण ने आक्रमण द्वारा चक्र से समस्त डोरी के टूकड़े-टूकड़े कर काट दिया एवं मुरु के सात हजार पुत्रों को कीट-पतंगों की तरह अग्नि में दग्ध कर दिया। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने मुरु का भी वध कर दिया। इसी कारण से श्रीकृष्ण का एक नाम 'मुरारि' है। मुरु राक्षस पंच-मस्तक विशिष्ट थे।

(भागवत पुराण से संगृहीत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

गतांक से आगे– (२७)

नरेन – ''बहुत दिन हुए आपके श्रीमुख से महाविद्याओं के विषय में कुछ नहीं सुना। द्वितीय महाविद्या माँ तारा के विषय में थोड़ा बहुत सुना है, आज यदि सुविधा हो तो तृतीय महाविद्या के विषय में कुछ बताऐं'' –

रामकृष्णदेव ने हँसते हुए उत्तर दिया –'' गिनती में जैसे पहले एक फिर दो को जाने बिना तीन के विषय में जाना नहीं जा सकता है वैसे ही तुम एक चन्द्र, दो पक्ष (कृष्ण और शुक्ल) को जाने बिना तीसरे नेत्र का विषय सीखने की सोच रहे हो? प्रथम महाविद्या कालीमाता के विषय में सुने बिना, माथे की काली (परासंवित) पाँव से नीचे पहुँचने पर शिव हो जाती है, यह समझे बिना ही तुम सीधे गीता के विषय में जानना चाहते हो? माँ चण्डी के विषय को जाने बिना सीधे कृष्ण के विषय में जाना नहीं जा सकता है। इसीलिए कहता हूँ पहले काली के वियष में जानो, कलियुग में काली के प्रसंग के अजान्ते क्या कल्की अवतार के विषय में बताया जा सकता है?''

नरेन – ''मेरे मुँह में उनका ही नाम आया, अत: उनके बारे में ही बताने को कहा। गुरु इच्छा ही सर्वोपरि है, तो आप जिनके बारे में बतायेंगे, वही सुनेंगे; परन्तु माँ चण्डी या काली की कथा सुनने पर या दर्शन करने से थोड़ा भय लगता है, शायद इसीलिए कठिन विषय छोड़कर कोमल में जाने की इच्छा हुई। मुझे पता है कि- 'मेरा कठोर हृदय है, जहाँ चरण रखने योग्य नहीं है'।''

रामकृष्णदेव – ''नरेन, जैसी तेरी बातें अति मधुर है वैसी ही माँ की कथा, माँ भवतारिणी और माँ तारा की कथा भी वैसी ही मधुर है। लगता है माँ का बाहरी रूप देखकर भयभीत हो रहे हो। तुमने मन्दिर में ग्रथित पाषाणों को ही देखा है, शायद माँ की छवि देखी ही नहीं है, माँ के हाथों के खड्ग से जो वंशी बजती है, चरण नुपूर से जो आलोक राशि गोपीकूल हो कर नाचती है – यह सब तो तुम्हें ज्ञात नहीं है और देखा भी नहीं है। इसीलिए तो भयभीत होते हो। यह सब सोचने से क्या माँ को देखा जा सकता है? आज रात को आ सको तो आना, माँ से अनुरोध करूँगा कि तुम्हारे कानों में शायद वंशी ध्वनि सुना पाऊँ।''

नरेन बोले, ''स्वप्न में कभी-कभी आपका अद्‌भुत रूप देखता हूँ। एकदिन देखा आप मेरे सिरहाने खड़े होकर माँ काली बनकर हँस रहे हैं। इस से मुझे भय भी लगा और आनन्द का भी अनुभव हुआ; फिर आँखों से ऐसी जलधारा नि:सृत हुई कि सारी रात ऐसे ही कट गई। सुबह उठकर सोचने लगा इतना अश्रुजल आया कहाँ से?''

श्रीरामकृष्णदेव ने बोले, ''जान लो कि सभी मनुष्य जल की एक झारी सदृश है एवं दोनों चक्षु उस जल के निर्गत होने का रास्ता है। पीने का जल जैसे कलस में रहता है वैसे ही देवताओं के लिए जो जल की आवश्यकता है, वह चक्षुओं में रहता है। माँ भवतारिणी यही तो कहती है – 'जिस दिन होगा आँखों में जल, उसदिन पूजा में नव दुर्वा श्याम की दल।' जब अश्रुजल से किसी की पूजा होती है तब उसदिन उनके अंग में आलोक राशि नृत्य करती रहती है।

पूजा की बात करते-करते माँ की बात भूल गये क्या? गंगाजल में उतरकर माँ गंगा की पूजा ही नहीं हुई! माँ ही सब भूल करवा देती हैं।

कालीपूजा की एकरात की बात सुनो! एकदिन आरती पूजा के पश्चात् माँ बोली; आज तुम्हें केला-बहु सजना होगा (केले के छोटे वृक्ष को साड़ी पहना कर नवपत्रिका देवी का रूप देकर दुर्गापूजा में उसी की पूजा होती है)। केला-बहु सजकर लाल किनारे की साड़ी पहनकर तुम गंगा स्नान करने जाओगे, गंगा स्नान जाते समय सिर्फ अपने पैरों की ओर नजर रखना। यह कहकर माँ चली गई। रात के ११ बज गये; गहन रात्रि, मन्दिर में प्रवेश कर सोचने लगा, लाल पाड़ की साड़ी कहाँ मिलेगी? कलसी हाथ में लेकर अपनी धोती के किनारे को ही लाल जवा से लाल रंग में रंग कर बाहर निकलते ही देखा, एक काली लड़की, दरवाजे के पास खड़ी होकर कहने लगी, 'यह लो तुम्हारी साड़ी – माँ ने भेजी है'।'' *...क्रमश:*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

उन्मेष

(१५)

अमावस्या (दिनांक - २३/०४/०९)

श्रीश्रीमाँ के अनमोल वचन–

देखो, ये ठाकुर-देवता जिन्हें माँ नाम से जाना जाता है, वे एक अखण्ड महाशक्ति हैं एवं उनकी लीला अनन्त है। माँ की लीला जिनके साथ होती है, वे भी माँ की लीला की व्याख्या कर, उसे समझा नहीं पाते। जिन्हें आद्याशक्तिरूपा महाशक्ति माँ के आँचल की छाया या गोद मिली है, एकमात्र वे ही माँ की लीला देखकर शायद उसे व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। माँ की गोद जिन्हें मिलती है वे स्वयं शिव होते हैं। वे माँ की लीला देखकर निर्वाक् हो जाते हैं। महाशक्ति माँ प्रणवेश्वरी - प्रणव ज्योति में ही उनका प्रकृत स्थान है। प्रणव के प्रकाश से साधक का चिदाकाश भेद कर वे रूप परिग्रह करती हैं। साधक माँ का वह अनिर्वचनीय रूप देखकर स्तब्ध रह जाता है; तब महाशक्ति माँ ही उन्हें अपनी पूजा हेतु अपनी शक्ति प्रदान करती हैं। योगमार्ग के 'केवल' या समाधि की जागृत अवस्था में, चिन्मयी माँ की बोधन-आवाहन-विसर्जन की पूजा करनी पड़ती है। माँ है परम ब्रह्ममयी, इसीलिए ब्रह्मविद्या के माध्यम से ही विश्व माँ के चिन्मयी ज्योति रूप की पूजा करनी पड़ती है।

दुर्गापूजा के समय जब प्रतिमा में प्राणप्रतिष्ठा करती हूँ तब मेरे हृदय का महाकाश उन्मुक्त होकर खुल जाता है। उस असीम आकाश में प्रणव ध्वनि होती रहती है। उस प्रणव ज्योति का स्वरूप भी तब कूटस्थ के अन्तराकाश में दर्शित होता है। प्रणव ज्योति से विराट् शब्द होता रहता है, जिसे मुनि ऋषिगण नाद कहते हैं एवं नक्षत्रों के समान स्वर्णिम ज्योति-बिन्दु अविरत निर्गत होते देखे जाते हैं। उसी के मध्य माँ का स्वर्णिम त्रिनयन प्रस्फुटित होकर सृष्टि की परिसीमा में आकर मेरी चिन्मय कारणसत्ता को भेद कर उसमें से निकलकर उस त्रिनयन माँ दुर्गा के श्री विग्रह के त्रिनयन के मध्य मिलकर अग्नि-ज्योति हो जाता है। समझे? यही है मृन्मयी में चिन्मयी की प्रतिष्ठा पूजा। बाद में स्थूल चक्षु खोलकर जब देखती हूँ तो पाती हूँ कि दुर्गा माँ की आँख सोने की आँख हो गई है। तब समझ जाती हूँ कि श्री विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। उन्हें आवाहन करने के बाद ही उन्हें सीमा में लाया जाता है, फिर संकल्प-सिद्धार्थ हेतु धारणा शक्ति के द्वारा माँ की पूजा की जाती है और फिर जिस दिन विसर्जन होता है उसदिन भी मेरा हृदयाकाश खुल जाता है एवं एक प्रदीप की उज्ज्वल शिखा के समान आलोक मेरी सत्ता के वक्ष से निकलकर हृदय का आकाश विदीर्ण कर फिर असीम में जाकर मिल जाता है।

जगा हृदय में आलोक वह्नि
आद्या नित्या वामा चिन्मयी तन्वी–
हृद्-पद्मासन पर विराजे कौन
वही, शुद्ध सत्वमयी रमणी।
तुम दुर्गतिनाशिनी दुर्गा महासती
महिषासुर मर्द्दिनी चिरन्तनी शाश्वती
शत्रु जिह्वा करे दलनी बगलामयी
जगतारिणी - मातः परमानन्दमयी।।
अनन्तदल पर सुनी प्रणव की तान
ॐकार नाद रूपी ब्रह्म सनातन
ऋद्धा-अनाहत रूपा प्रणवधात्री
सगुण ब्रह्ममयी विश्वविधात्री।।

–श्रीश्रीमाँ द्वारा रचित

महालया - २००४

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दु:ख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। गुजरे हुए कल को जाने दीजिये, भविष्य को जाने दीजिये, वर्तमान को भी जाने दीजिये, और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झाँक कर देखिये। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है तो आप जीवन-मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। **–श्रीश्री गौतम बुद्ध**

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (२५) : दादा (श्रीश्रीबाबा) प्रति मुहूर्त परीक्षा लेते थे एवं उस परीक्षा के द्वारा ही दादा अपने दीक्षित संतानों की जाँच करते थे। किसी एक दिन हम सब बैठे थे, दादा को जल की आवश्यकता थी, पीने हेतु। दादा के घर में एक मृत्तिका कलश था। एवं जल निकालने के लिए मुठिया (handle) लगा हुआ छोटा गिलास रहता। उससे जल निकालकर हमलोग समीपस्थ गिलास को भरते। इसी तरह निकाल कर हमसबों में से किसी एक ने दादा को जल दिया। दादा जल पीने से पूर्व गिलास के भीतर निरीक्षण करने लगे। एवं विशेष गभीरभाव से उसे देखने लगे। तत्पश्चात् किसी एक व्यक्ति से उन्होंने कहा – ''देखो तो, गिलास के भीतर कुछ दिखाई दे रहा है, मानों कुछ हिल रहा है?'' – जिस कारण बाबा (दादा) ने कहा कि उसमें कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई न देने पर भी उनकी दृष्टि में अवश्य कुछ दिख रहा है! अत: आश्चर्यजनक रूप से देखते हुए उस व्यक्ति ने कहा, ''हाँ बाबा इसमें कुछ एक वस्तु हिल रही है।'' तब बाबा ने उस व्यक्ति के पासवाले व्यक्ति से कहा, ''तुम देखो तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या?'' उसने भी पास वाले व्यक्ति की तरह बोला, ''हाँ बाबा, कोई एक वस्तु अस्पष्ट रूप से दिख रही है।'' इसप्रकार दादा ने एक-दो व्यक्तियों से भी इसी तरह देखने को कहा। एवं उन सबों से भी एक ही उत्तर पाया। तत्पश्चात् आशीषदा की बारी जब आयी, तब उन्होंने अच्छी तरह से देखकर कहा, ''दादा, जल तो परिष्कृत है। कुछ भी नहीं है। आप जल पीजिए।'' दादा ने तब स्मित हँसी के साथ कहा, ''कहते हो कि कुछ भी नहीं है, तब दो, जल पी लेता हूँ।'' यह कहकर दादा ने जल पी लिया। तब दादा ने कुछ समय पश्चात् धीरे-धीरे कहा – ''सच्ची दृष्टि होती है योग पथ पर जाने का प्रथम सोपान।''

आशीषदा ने और एक दिन बाबा से कहा, ''दादा, कभी-कभी चिंता होती है, कि अगले जन्म में कहाँ, किस रूप में जन्म लूँगा? पशु-बकरी-कीट के रूप में जन्म लूँगा अथवा मनुष्य के रूप में इस वसुधा पर आऊँगा?'' बाबा ने तब एक अद्‌भूत भाव से स्नेह भरी दृष्टि से कहा, – ''तुम सब मेरे जन्म-जन्मांतर के दीक्षित संतान हो। परवर्त्ती जन्म में तुम सब उच्च कुल में एवं आध्यात्मिक चेतना संपन्न परिवार में गृह को प्रकाशित करते हुए आओगे। मेरे क्रियान्वित संतानगण निर्विष साँप नहीं है। वे सब राजगोखुर (गेहुँवन) साँप है।

प्रसंग (२६) : हमारे दादा (आशीषदा श्रीश्रीबाबा को दादा कहकर संबोधित करते थे) मानों सूक्ष्म चलचित्र की तरह भविष्य की सारी घटनाएँ देख सकते थे। किस वर्ष की यह घटना है यह ठीक तरह से याद नहीं है, संभवत: न्यूजीलैंड और भारात के मध्य क्रिकेट का खेल हो रहा था, दादा और हमसब उपर दो मंजिले घर पर बैठकर दूरदर्शन में खेल देख रहे थे। न्यूजीलैंड क्रमश: चौके-छक्के पीट रहा था; भरतीय खिलाड़ी केवल पूरे मैदान में दौड़ रहे थे। हम सबों ने कहा, ''दादा अब और देखना अच्छा नहीं लगता; आप अभी उन सबों को मैदान से बाहर (out) करने की व्यवस्था कीजिए; हमलोग हताश हो गये हैं।'' दादा ने अकस्मात् कहा, ''तुम सब क्या एक खिलाड़ी को मैदान से बाहर (out) देखना चाहते हो?'' यह बोलकर दादा चुपचाप बैठ गये। सचमुच! ठीक अगले गेंद पर ही न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी ओवर-बाउंड्री गेंद पर कैच-आउट हो गया! – हमलोग आनन्द से चिल्लाने लगे, क्योंकि वह खिलाड़ी किसी उपाय से मैदान बाहर नहीं हो पा रहा था। – परंतु यहाँ एक तथ्य है कि आपलोगों को यह महसूस होगा कि श्रीश्रीबाबा ने उस खिलाड़ी को आउट कर दिया है। यह किसी भी सद्‌गुरु द्वारा कृत नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ यह पक्षपात कहा जाएगा। उस देश (न्यूजीलैंड) ने क्या गलती की कि सद्‌गुरु महाराज अपने देश का पक्ष लेकर उसे आउट कर देंगे। यह सब महात्माओं के कर्म नहीं है। नहीं तो महात्मागण अपने महान आदर्श से च्यूत हो जाऐंगे। इस घटना के संदर्भ में श्रीश्रीबाबा ने दिव्य दृष्टि से पहले ही जान लिया कि उस निर्दिष्ट गेंद से ही, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी आउट हो जाएगा। भविष्य में क्या घटना घटने वाली है यह वे जान जाते थे।

महात्मागण त्रिकालदर्शी होते हैं। वे अपनी प्रज्ञा दृष्टि, दूर दृष्टि एवं दिव्य दृष्टि से ब्रह्मांड की सारी घटनाओं से अवगत होते हैं। महात्माओं का यह एक विशेष प्रकार का योगैश्वर्य है। *...क्रमश:*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिबपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

आश्रम समाचार

१५ अपैल –नववर्ष (१४२३) की शुभसंध्या पर श्रीश्रीमाँ के दर्शन के अभिलाषी अनेक भक्तों का समागम हुआ। सत्संग

में श्रीश्रीमाँ ने एकत्रित भक्तों को शिक्षणीय उपदेश दिए। एक सुमधुर भजनों का अनुष्ठान परिवेशित किया गुरुभ्राता और भगिनीगण। इसी दिन हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या भी प्रकाशित हुई।

९ मई – अक्षय तृतीया की पुण्यतिथि पर श्रीअन्नपूर्णा क्षेत्र में श्रीश्री गजानन की पूजा एवं यज्ञानुष्ठान के माध्यम से उनकी विग्रह की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई। दोपहर में समग्र भक्तबृंदो के मध्य प्रसाद वितरण एवं संध्या में गुरुभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों द्वारा संपन्न एक मनोहर संगीतानुष्ठान द्वारा इस आनन्दपूर्ण दिवस का समापन हुया।

१७ मई – इस दिन संत श्री इमतियाज आलि भाईसाब

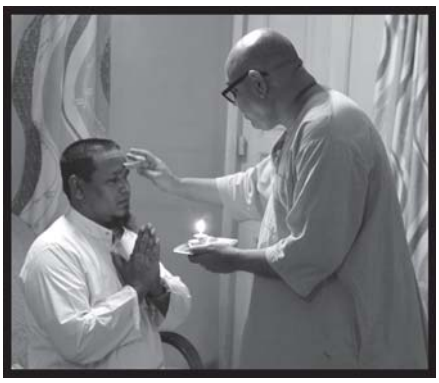

श्रीश्रीमाँ के दर्शन हेतु आश्रम पधारे और कुछ समय सत्संग में व्यतीत किया।

२१ मई –बुद्ध पूर्णिमा की पुण्य तिथि पर श्रीश्रीबाबाजी महाराज के श्रीविग्रह प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में भोग निवेदन और प्रसाद वितरण किया गया। संध्या में आश्रम मन्दिर में श्रीश्रीमाँ ने पातंजल योग दर्शन और गीता पर शिक्षणीय वक्तव्य पेश किए। उसके उपरांत समवेत संगीत का एक अनुष्ठान पेश किया गुरभ्राता और भगिनियों ने। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का परिचालन गुरुभ्राता डा: श्रीवरूण दत्त ने किया।

२९ मई – इस दिन सायंकाल में आश्रम मन्दिर में रवीन्द्रसंगीत प्रस्तुत किया श्रीमती अनीता पाल और उनके साथी शिल्पियों ने। उन्होंने विशिष्ट रवीन्द्रसंगीत शिल्पी श्रीमती सुचित्रा मित्र से संगीत शिक्षा प्राप्त की थी।

७ जून–६जुलाई– इस अवधि में सिद्ध सन्त श्रीश्रीटाटबाबा की उपस्थिति ने आश्रमवासियों को उनकी सेवा का सुअवसर प्रदान किया।

२० जून –श्रीश्रीजगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन श्रीश्रीमाँ की आविर्भाव तिथि मनायी गई। श्रीश्रीअन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र में अनुष्ठित हुई श्रीश्रीगुरुपूजा एवं नारायण पूजा। दोपहर में उपस्थित भक्तवृन्दों ने प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में आश्रम मन्दिर में भजनों का मनोहर अनुष्ठान प्रस्तुत किया गुरुभ्राता और भगिनियों ने।

२६ जून – इस संध्या में आध्यात्मिक सभा के १९वे पर्व पर 'उपनिषद् प्रसंग' पर अपना तात्विक वक्तव्य प्रस्तुत किया डा: वरूण दत्त ने।

आगामी अनुष्ठान सुची

जन्माष्टमी – २५ अगस्त, गुरुवार
अध्यात्मिक सभा – २५ सितम्बर, रविवार, संध्या ७ बजे
महालया – ३० सितम्बर, शुक्रवार
दुर्गा नवरात्रि – १ अक्टूबर से ११ अक्टूबर २०१६
६ अक्टूबर (पंचमी):– संध्यानुष्ठान
८ अक्टूबर (सप्तमी):– संध्यानुष्ठान
९ अक्टूबर (अष्टमी):– श्रीश्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के तिरोभाव दिवस उपलक्ष्य पर दोपहर में भण्डारा।
१० अक्टूबर (नवमी):– मध्याह्न में श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद भण्डारा
कोजागरी पूर्णिमा (लक्ष्मीपूजा):– १५ अक्टूबर २०१६, शनिवार

Hansa-Anu-Maan – Sadguru's Gift to a Sadhaka

'Sri Hanuman' is a spotless Puranic character, revered and loved as a divine being – one who combines supreme power, steadfast loyalty, indomitable courage, child-like self-less generosity and pious goodness in a manner unparalleled in Indian mythology.Again in Yogic terms his life and activities carry a special meaning that can be interpreted in many ways. While the whole of Ramayana is a treatise in the Yogic Science of Self-Realization, Sri Hanuman's character occupies a unique role. In this article we make an attempt to take a look at some events of the life of Sri Hanuman through a sadhaka's lens that I found useful for myself. We begin with the birth of this extraordinary personality and follow a couple of key events of his early life and suggest a spiritual interpretation. We end with a unique tailpiece as seen from the inner eyes of Sree Sree Maa.

Keshari, king of the Vanaras lived in the Sumeru mountains. Hanuman was born out of the embodiment of Keshari and the spiritual-force of Pavan-dev or Lord Vayu. His mother's name was Anjana or Anjani. One day, while Anjana was roaming in the forest, Lord Vayu also happened to be there. Seeing Anjana's beauty, Vayu-dev was naturally attracted and embraced her. When Anjana rebuked Vayu for his actions, Lord Vayu indicated that he has only mingled with her in mind and spirit, and this will not cause her any loss of virtue and through this interaction she will beget a son who will be as powerful as Vayu. Eventually Anjana gave birth to Hanuman and lived with him in a cave.

[The lion-hearted sadhaka (represented by Keshari[1]) remained in deep inward thought seeking the highest spiritual goal (as symbolized by living in Sumeru[2]). Such constant contemplation resulted in the arousal of his[3] consciousness and readiness for Yoga. The divine teacher (Sadguru), seeing the sadhaka's eyes lined with the urge towards realization, considered him an eligible aspirant. Through the grace of his Sadguru, the sadhaka received initiation into Yoga. The Sadguru illuminated the inner eyes of the sadhaka with 'Chaitanya-Anjana' - the eye-liner (Anjana) of chit-shakti filled life-force (Prana-Vayu, symbolized by Lord Vayu). Thus 'Vayu embraced Anjana' and sowed the seed of a new phase of life – spiritual life. Through the power transmitted by the Sadguru's divine seed mantra, pristine light emanating from the soul radiated within and Hansa-Anu-Maan (Sadhaka's soul-lit God-directed consciousness) was 'born'. The sadhaka entered the kingdom of yoga, powered by the radiating force of the newly aroused 'spiritual mind' and began to 'live' in the 'cave' of the kutastha[4] where progress in sadhana could be self-experienced.]

The hungry baby Hanuman, seeing the newly risen Sun, assumed it to be a fruit and leapt towards it. Seeing Hanuman moving skywards,

[1] Keshari, means king lion
[2] Sumeru refers to pole or mountain top
[3] Equally applicable for women aspirants
[4] Kutastha is the cave of the inner eye where the three worlds, namely gross, subtle and causal are experienced by the spiritual mind.

Pavan – in view of his paternal attraction – began to follow him. Soon Hanuman approached closer to the Sun. Considering him to be a child, the Sun refrained from scorching Hanuman and took him on his chariot. At that time, Rahu was in the process of covering the Sun to form an eclipse. Seeing Hanuman beside the Sun in the chariot, Rahu considered Hanuman to be a challenger to natural law and went to Lord Indra with his complaint. On the request of Rahu, Indra approached the Sun and thrust his Vajra or thunderbolt on Hanuman. Indra's thunderbolt struck Hanuman and broke his hanu or (jaw / chin). He fell unconscious on the ground. Seeing this, an angry Pavan-dev took Hanuman away to safety into a mountainous cave, hid him, and stayed there inside. With Vayu having left the atmosphere, a serious problem arose to the existence of life. The three worlds were terrified at the consequences. The Devas went to Lord Brahma for guidance. Lord Brahma then took the Devas to the cave and on his touch, Hanuman's body regained life. Lord Vayu was also overjoyed and again came out to permeate the world.

[The newly 'born 'Hansa-Anu-Maanor spiritual consciousness greatly energized the sadhaka. Hungry to reach the goal quickly he completely immersed in sadhana. Perceiving a bright sun within the kutastha, he propelled his mind towards the light in all earnestness, assuming it to be the 'fruit' of spiritual pursuit. The supporting life-force of his Sadguru (Guru-shakti) helped carry his consciousness towards the light-emanating goal. With the power and grace of his Guru, the sadhaka was able to reach the inner realms of Shushumna marg – the sunlit path and reach the agna chakra, thereby getting a glimpse of the first step to liberation. But the sadhaka was yet to attain complete mastery of his lower mind-intellect-ego. Rahu (the power of veiling truth), seeing the sadhaka's attempt to reach the agna chakra, in an incomplete state, informed Indra (Lord of the indriyas[5]) that the law of nature was being challenged. Indra hurled his powerful Vajra, which 'broke' the sadhaka's lower ego (represented by the chin or 'hanu'). Having the layer of his outer ahankara removed, the sadhaka now became eligible for higher attainment. He now pierced through the agna chakra but lost his consciousness in the process. All Vayu within him became still. To save him from disembodiment, the Sadguru was approached. Through the supreme 'Brahman' touch of the Sadguru, the sadhaka regained his consciousness and his body returned to life.]

The Devas and Lord Brahma, satisfied at the outcome, blessed Hanuman with divine qualities. Through Lord Brahma's boon, he instilled fear in his enemies and fearlessness in his friends, relieved a sufferer from the pangs of uncontrollable primal instincts and became famous for his deeds and character. Lord Indra remarked that since his 'Hanu' was broken from the impact of Indra's Vajra, he would become famous as 'Hanuman' and no weapon, not even the Vajra, would be able to kill him. In fact, his body would become stronger than the power of the thunderbolt. Surya gave him a hundredth of its power and said that he would teach him the sacred scriptures at an opportune time through which Hanuman would gain the quality of being undefeated in debate. Lord Varun blessed that he would be protected from death by water. Yama granted him freedom from Yama's danda or 'staff of death'. Apart from these he received several divine gifts including but not limited to the capability of anima-laghima (or change in size), relief from illness or despondency, ability to be unaffected by apparently invincible weapons like Kubera's mace, Shiva's trident or those created by Vishwakarma. After this, Lord Vayu returned Hanuman to Anjana and told her of the wondrous tale of divine boons.

[Returning from his first 'death experience', the sadhaka was now ready for the next stage. As

[5] Indriyas refer to the sensory perceptions including the gross mind

he proceeded in sadhana, through the grace of his Sadguru, the sadhaka's 'Hansa-Anu-Maan' consciousness began to receive divine qualities through which the sadhaka was able to make rapid progress in his spiritual pursuit. Whenever the enemies of sadhana (various lower forces) tried to dominate, his 'Hanuman' consciousness would force them to retreat. All his positive qualities would gain great strength and push him energetically forward. Since he carried with him one hundredth power of Surya, Hanuman-consciousness is referred to as the awakening of the 'Rudra Avatar' within. Through the sun-lit rays of truth the great secrets of the scriptures like the science of creation, laws of nature and the fundamental subtle principles unfolded within him. He never 'lost a battle' anymore – that is, he never fell into the clutches of lower forces. Every such attack of the indriyas made him stronger than before. As he ascended into higher realms, he was able to absorb even the higher forces of the six chakras and their associated fundamental principles without loss of self-consciousness. He experienced the immortal soul and gained all the satwik gunas. Thus the sadhaka returned back to spiritual life of the inner eye with renewed vigour and power.]

Having received such divine qualities that few could challenge, Hanuman began to disturb the sages with his pranks and mischief. Advice of Keshari and Vayu fell on deaf ears. Finally, fed up with the antics of Hanuman, sages Bhrigu and Angira cursed Hanuman to forget his own powers and capability for a long time. Later at the time of Devi Sita's rescue when it became absolutely necessary to cross the ocean, Hanuman was reminded of his forgotten strength and encouraged to leap successfully across the ocean in the name of Lord Rama.

[The sadhaka now began to play with his newly acquired divine powers or vibhutis. This child-like play became a dominant past-time and his true sadhana suffered. Even though his mind and life force would constantly remind him to refrain, his childish passion to play with his vibhutis became uncontrollable. Advancement in sadhana suffered. His Sadguru (represented by the sages) withdrew these divine powers temporarily and said that he would regain them only for purposes of true spiritual progress and not any other purpose. Under such circumstances, the sadhaka continued perfecting his sadhana in the six chakras but was unable to go beyond the agna chakra on his own. On completion of this phase, when it became absolutely necessary for his to 'leap across' the great ocean of unknown to take the Kula-kundalini Shakti (Devi Sita) from the agna chakra to the sahasrara and reunite with the Supreme Soul (Lord Rama), the Sadguru re-vitalized the divine shaktis into the sadhaka's 'Hanuman-consciousness'. In the name of the Lord, the sadhaka successfully made his leap of faith into the unknown, crossed beyond and permanently reached the feet of the Supreme Divine. His inner consciousness attained the divine title of 'Sri Hanuman'.]

These and many other tales of the life of Sri Hanuman have similar / alternative yogic interpretations.

Tailpiece – Discussions with Sree SreeMaa provided us, as usual, with a new angle on Sri Hanuman and his divine descent. Here is a summary. She said,

'There are deeper reasons behind the advent of an avatar. An avatar's particular form is a special manifestation of Saguna Brahman that reveals intricate secrets of the principles and science of creation in a new way. Avatar forms typically appear for participation in Bhagwat Leela. 'Rudra' also refers to the enlightened Shiva form of the supreme lord. So 'Hanuman' is also a Shiva Avatar. Behind this great avatarhood lies a deeper tale. From eyes of realized yogic truth, one can see within the soul-space of Hanuman an ancient Brahman realized rishi. This great Maharshi, during his path to attainment of Bhagawat-hood, participated in the divine leela of Lord Rama through this unique character of Sri Hanuman – displaying a

combination of bhakti, vairagya and dasyabhava that has remained cherished in the minds and hearts of all aspirants as a role model.

In addition, through his life events and acts, several yogic insights unfold. Normally 'hanu' means the area of the jaw and chin/cheek. Again in yogic terms 'Hanuman' can be seen as a combination of 'hankar' (the 'ha' of hansha) + 'anu' (brahmanu) + maan (ambit) – that is the innate nature of the individual soul-space. That is why, even while he is Shiva, he manifests the power of Atma-Shakti and its character – the strength of pious righteousness, making him an extraordinary form of saguna-brahman-sanatan.

In ancient times lived a pious sage called Shilad. Once while he was returning from Shiva-loka, he found his ancestors hanging in hell. On query, they revealed that Shilad's refusal to marry and carry on his lineage had resulted in their current pitiable state. For remission, they advised him to worship Lord Shiva in quest of a son. On carrying out his penance, blessed by Lord Shiva, Shilad requested for an ayoni-shambhava (one who is born outside of a womb) son. Shiva granted the same and left. Sage Shilad then furrowed the earth to ready it for the yagna. As he struck the ground, a divine and powerful youngster emerged. Initially Shilad did not notice the child. Later, being alerted by a divine message, he picked up the little one and accepted him. The child was christened 'Nandi'. When Nandi was seven, the Aditya deities Mitra-Varun visited his father's ashram. On being satisfied with Nandi's service, they proclaimed that Nandi would meet his death on attaining the age of eight. Shilad was shocked. When Nandi came to know about this, he went off to worship Lord Mahadeva. He embarked on deep penance after which he was blessed by the Lord, thereby attaining victory over illness, ageing and death. Later, on his path towards fulfilment of sadhana through participation in Bhagwat Leela, Sage Nandi descended as Sri Hanuman in the Ramayana as 'Ram-doot' or representative of the soul. Therefore Hanuman, soul's true representative, is fully trustworthy or one who is the manifestation of 'vishwas'. Vishwas means Vigata-Shwas or still-breath. Still-prana is the soul and Faith in Truth is its nature or maan. Thus Hanuman is Ram-doot – the manifestated representative nature of the soul in every being. Nandi Rishi is also Shiva's foremost sevak and leads Shiva's delegation or ganas. Taking the form of a bull, he is Shiva-Parvati's vahan or vehicle to traverse the universe. That is why he is called Nandishwar. The bull-form represents indomitable strength of the soul. Thus Nandi is a Brahmarshi sage, who is one with Shiva and manifested as the ayoni-shambhava Sri Hanuman to relieve Devi Sita or Kulakundalini Shakti from the clutches of worldly pride and passion represented by Ravana, thus acquiring one more glorious title of SankatMochan or one who provides relief from deep crisis or trouble.'

Then Sree Sree Maa pointed to a photo of a great reclusive saint in our Ashram and said – 'Sri Hanuman came again in this form recently[6]'.

May we all join our hands together to pay homage to the glory of 'Sri Hanuman Consciousness' within:

O Hansa-Anu-Maan, Soul's expression of righteous nobility,
O Sri Ram-doot, Supreme's messenger of unflinching loyalty;
O Mahaveer, Atma's Shakti of indomitable courage-power,
O SankatMochan, God's Grace – sadhaka's crisis-reliever;
Arise, Awake within – take over our mind-intellect-ego seat,
And lead us to the divine destination – the Lord's Holy Feet.

– Prof. Partha Pratim Chakrabarti, *Her Blessed Child*

[6] Those who are feeling an uncontrollable urge to know 'who' can meet me with packet of chocolate nutties (Cadburys), sufficient for all the 'nuts' like me in the Ashram.

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(25)

Dada (Sri Sri Baba) used to test his disciples every moment and judge his disciples. - One day, we were all sitting, Dada asked for some water to drink. There was an earthen pot containing water in Dada's room and there was a small glass fitted with a handle to pick up water from the pot. We used to pick up water with it and fill the glasses kept beside. In that way, somebody among us offered water to Dada. Before drinking, Data started inspecting the interior of the glass deeply. Then he said to someone, "It seems something is lying inside the glass and that too a moving object. Have a look." When Baba (Dada) is saying that something is visible, there must be something visible in Baba's eye, even though apparently nothing is seen. Hence the gentleman looked blankly in the glass and said, "Yes Baba, something is moving inside." Then Baba addressed the man beside him and said, "Why don't you see whether something is there or not?" He replied like the previous man, "Yes Baba, something seems to be there hazily." Dada asked a few other disciples and got similar answer. Finally, when my (Ashish) turn came, I looked carefully and said, "Dada, this is absolutely clean water. Please drink it." Dada smiled softly and said, "When you are sure that there is nothing, then let me drink it." - and he drank the water. After a while Dada said gently, "Correct observation is the basic key to climb up the ladder of yoga."

[Once Ashishda asked Baba, "Dada sometimes I think deeply, where and how would be my next birth? Shall I take birth as cow, goat, insect or as a human on this earth? Baba cast a peculiar glance of affection and said, "You are my disciples in several birth. You will glorify the house of respectable and spiritually inclined families in your next birth. My disciples who perform kriya are are not non-venomous water snake but are the royal cobra, the hooded and poisonous snake.]

(26)

None of the future incidents are unknown to Baba -

Our Dada (Ashishda used to address Sri Sri Baba as 'Dada') used to visualise the future like microfilm. I don't remember the year clearly, probably there was cricket match between New-Zealand and India, we all including Dada were viewing the cricket match in the 1st floor. The players of New-Zealand were striking boundaries and over-boundaries and the Indian players were running to field the ball. We said, "Dada, we don't feel good seeing the match any more; do something to bold them out, we are frustrated." Dada said suddenly, "Do you want to see an out for the batsman?" Then Dada kept silent. Strangely, the New-Zealand player hit over-boundary in the next ball and was caught out! We exclaimed and shouted in joy because that player was batting for a long time. - Now here there is a serious matter of contemplation – from this incident, nobody should think that Sri Sri Baba had actually made this bold out possible. This can never be done by any sadguru maharaj because this denotes an act of partiality, why should Gurumaharaj discriminate between New-Zealand and India? No mahatma does this as this action will deviate him from his ideal. Actually, Sri Sri Baba could see with his divine vision that the particular ball is going to make the batsman retire from the crease. They can see what is going to happen in the future.

The mahatmas can see the three ages collectively – the past, present and future. They can know all events of the universe with their wisdom vision, farsightedness and divine vision. These are the yogic feats of a mahatma.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

My Life With Anirvan
Part - XXVIII

The next letter of Anirvanji from Shillong is dated 14th June '64. He writes:

My dear Gautam,

Your letter of the 10th. Yesterday, I completed two months of illness! The longest in my life. The last symptom – the urge to get up from bed even once after I have retired for the night has disappeared and I am quite O.K. now. But I am not straining myself. The month of June must be a holiday. The doctor will continue his weekly injections till July 18 as a matter of precaution.Today I am going to Usha's[1] house to celebrate the occasion of my recovery and having my meals there and from tomorrow, I am independent and shall cook for myself! All fun!

Yes, I feel it is a new phase or life. But, I don't care whether it is life of death. The white radiance of Eternal Existence – The Shivalingam of Amarnath engulfs all – when you go to Him, convey my self-consecration to him. I remember how Vivekananda, when he came back after seeing Him said – he had His vision and was granted the boon of immortality. And almost immediately after that he passed away. A paradox, is not it? After all, life and death are two wings of His existence – Pure and Nude.

This much is certain I am leaving for Calcutta immediately after the Pujas. If it is Keyatala, well and good. If it is Hridaypur[2], well and good too! Let us float in the stream of Haimavati's will.

Nehru is dead and gone – the last trace of Britsh Imperialism. Even if there is a crisis, I feel we are going to turn a new leaf in our national life in 1965. I scent it in the air.

About S. Brahmara, I prefer to have my set completed without breaking Mukuda's set.

Narayani of Puri (why not call her Jayanti as I do to avoid confusion) will be reaching Calcutta perhaps on the 17th.

I have sent 'Europa' with Himangshu Babu. How are Bablu and Kiki doing? I have not enquired after them for a long time. With love for you all. *Ever yours … A*

In the next letter Sri Anirvan talks more about his transferring of Haimavati from Shillong to Calcutta and about my pilgrimage to Amarnath.

Om *Haimavati, Shillong*
24.6.64

My dear Gautam,

Your letter of the 20th. Jayanti has written about her check up in details. The future prospect seems to be bright. If she is completely cured, I can expect much work from her especially as I shall be in Calcutta. Well, let her will be done! I think, there will surely be a way out in case of Hridaypur. The name sounds so fine! Only, one has to do some Sadhana before one can establish Haimavati in Hridaypur! Again, I say, let her will be done!

I am thinking of leaving Shillong immediately after the Laxmi puja. If Sudha and Sharad start after the Mahalaya when the Puja holidays begin, we shall have two weeks in all for packing etc. I have more than three months in hand. From July, I intend to begin arranging and selecting things, so that the package can be done smoothly and in minimum of time, say in five or six days. I am leaving the house to Prof. Panigrahi, who will be in charge of the Pathmandir after me.

I endorse your feeling as regards the urge that has come upon you. Be free, as free as air, you

[1] Usha Bhattacharya: Principal, Lady Kean College, Shillong; a friend, devotee and Patron of Anirvanji; disciple of Sri Aurobindo and Mother and active member of Sri Aurobindo Path Mandir, Shillong.

[2] Hridaypur: City of heart! It is small town in North 24 Parganas or Sealdah (Kolkata) ranaghat line. Bina Das's brother had a plot of land there near the railway station. In the end we had to give up the idea of shifting Haimavati there.

are not bound by anything. If you are destined to work for the another, meet Her personally first and take orders directly from Her. Work will then become a blessing and not a drudgery. Do not think of what is going to happen later on. At present, your only task is to see Lord Amarnath. Lay yourself bare before Him and take His commands. Let the whole pilgrimage be done in a spirit of dedication. Make yourself blank and it will be filled up with His Light.

I am quite o.k. now. Though the doctor is still sticking to me and prescribing tonics etc. I am obeying him. From July, I shall begin to work at half speed, attaining full speed in August. I am in no hurry about anything.

Hope Bablu and Kiki will be industrious now.

With love for you all,

Ever yours … A

-Sri Gautam Dharmapal

The Philosophy of Truth

The Fundamentals of the Mind (Psychology)

Chapter 9

Mahatma continues – A story came to my mind. A king had one daughter only. The king had the fancy and hence he domesticated a goat. He used to give lot of food to the goat like grains, paddy, grasses, etc. daily but the goat was never contended. It started eating again after a gap of one or one and half hours. When after several efforts the king could not satisfy the goat, he declared every where, "Whoever can satisfy my goat and satiate his hunger, so that the goat does not ask for food again, will be fortunate enough to marry my daughter." Many candidates assembled to feed the goat with the expectation of a chance to marry the beautiful princess and to inherit the kingdom, as he did not have any son. Each candidate started keeping the goat for two to four days and feed it. Whenever after feeding the goat in plenty, anybody used to bring it to the king, the king used to offer some better food to the goat, who started eating it. The king would tell then, "The goat is eating even now, so its stomach is not full. Hence you have failed." Many candidates tried in this way but they failed. Next, an intelligent person fed the goat with bael leaves only for 6-7 days because he knew that bael leaves destroy hunger and appetite. After 8 days, he saw that the goat had so much anorexia that it did not eat anything at all. Then he went to the king with the goat. The king also tested like before and saw that the goat truly was not desirous of having anything. The king then gave the marriage of his daughter with that man. The man thereafter lived happily with the beautiful princess and plenty of royal wealth.

My son! Your mind is like the goat – never satiated even with plenty of feeding. But the intelligent man who knows that by drinking nectar of spiritual essence, one can satiate the material desire, stays in satsang and drinks the spiritual nectar. Hence that man acquires the splendour of wisdom and rests in eternal peace. My son! Only satsang can imbibe discrimination and dispassion and the dispassion lends completeness to the mind. Desires make the mind empty and cannot fulfill it. Thus desirelessness leads to liberation or moksha. The sruti says, "Ashaa hi paramang dukkhang, nairasshang paramang sukham" - meaning 'expectation brings great sorrow and the absence of it brings extreme bliss.'

In the meantime, darkness started to descend. The mahatma resorted to silence and the bhakta prostrated before the mahatma and went off for his work. *...to be continued*

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by

Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(19)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

Let us now have a discussion on the three principal states of your consciousness – *Jagrata* (Awake), *Swapna* (The state of Dreaming) and *Sushupti* (The state of deep dreamless sleep). When you are awake, your sensory receptors are fully active and allow you to pragmatically experience external physical entities. In the state of dream, your sensory receptors are majorly inactive and in a partially inert state. Whatever is beheld during dream is perceived as unreal when you wake up. Although the exact subjects and events in your dreams may be unreal, the scriptures pronounce that distinct classes of dreams have specific and well-defined effects.

Bhagwan Kishori Mohan

Now, attempt to comprehend *Sushupti*, the state of deep dreamless sleep. In deep sleep, your capability of objectification ceases completely and you become unconscious about your body, mind, senses and even your own existence. When your consciousness withdraws out of *Sushupti*, the reminiscence of this blissful sleep state only lingers with you. If you did not self-experience the bliss yourself, how do you remember it after wakeup? If the self-experience was not actual, its memory cannot be real too because you remember only what you experience. In *Sushupti*, as the mind along with its senses is wound up in a state of quiescence in the Absolute of the heart, there is a complete absence of desires and activity, the consciousness being only nominal.

Now, understand that these three states of consciousness are mutually opposing in nature and you remaining unchanged, dwell in all these three states. You cannot identify yourself with any of these states because they being mutually opposing, cannot be concurrently dwelled-in. Thus you, identifying yourself with the *Jagrata* (awake) state cannot be simultaneously dreaming etc.; rather, you transcend from one state of consciousness into another, attaining a new state only after leaving the previous one. This may be considered similar to changing your attire — through the transformations of your attire, you remain the same within each one of them.

Therefore, your *self* can be none of these three states, *Jagrata*, *Swapna* or *Sushupti*. Your original self remains unvarying in a state of absolute timeless perpetuity through all temporal transformations. You exist as the knower and perceiver in all these states. Inert intellect can never attain the capacity of realizing any phenomena, only Consciousness (*Chaitanya*) can possess this capability. You are the knower — and hence, you are a manifestation of Consciousness. You never undergo any transformations of state and always exist in the Absolute as the timeless witness of the ways of intellect. However, due to your eternal ignorance-bounded connection with intellect, you consider the transitions in the states of your intellect as your own state transformations. Falsely associating and identifying yourself with the intellect, senses or the physical body, you sometimes refer to your physical body, or sometimes your tri-attributed (*trigunatmika*) intellect as "Me" and "My"; however you essentially are Consciousness — beyond all of them.

When knowledge of the principles of the Soul (*Atma-tattwa*) enlightens within you through meditative penance, you will realize yourself as the manifestation of *Chaitanya* — beyond the tri-

attributed mental traits, beyond attachment, beyond defeat, eternal, immortal and all-pervading. The *Brahmic* Consciousness remains agelessly unaltered above manifestative transformations of state. However, due to His omnipresence along with His seeded existence within the *jiva*'s embodiment as well as the inanimate world, He has been projected in various different expressive forms. The scriptures have named and defined Him in various ways, for example, *Purusha*, *Akshay-Purusha, Uttam-Purusha, Atma, Paramatma, Deva, Devata, Ishwar, Parameshwar, vasudev, Narayana, Vishnu, Maha-Vishnu, Rama, Krishna, Shiva, Paramashiva, Vyom, Akash, Prana, Mahakash, Kali, Ganesh, Durga, Jagadhattri, Kal, Mahakal, Bhuma, Harda* etc. He is also above the distinctions of gender and has been referred to in all three genders.

Through the maxims of the scripture "*Vedanta-Darshan*", *Maharshi Vedavyas* has proclaimed that the essential manifestation of *Chaitanya* remains beyond forms, embodiments and the mediums of perception.

...to be continued

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

News in Brief

15th April - On the occasion of the Bengali new year, a lot of devotees visited the Ashram. Sree Sree Maa gave important spiritual advice to the devotees. Thereafter she sung some beautiful bhajans and made the evening blissful. The previous issue of Hiranyagarbha was released.

9th May - On this auspicious day of "Akshay Tritiya", the idol of Sri Sri Gajanan was enthroned at "Sree Annapurna Kshetra" through a puja and yagna. Prasad was distributed in the afternoon and a cultural programme was organized in the evening.

17th May - Sri Imtiaz Ali Bhaisahab visited Ashram and spent some time in Satsang with Sree Sree Maa.

21st May - On the occasion of Buddha Purnima and Sri Sri Babaji Maharaj's statue installation anniversary, bhog was offered in the Ashram. In the evening Sree Sree Maa gave a short discourse on Patanjal Yog-darshan and Gita. A collection of beautiful chorus bhajans were presented and then like every year the spiritual question-answer session was conducted by our guru-brother Dr. Barun Dutta.

29th May - Smt. Anita Paul and her associates presented 'Rabindra Sangeet' on this evening in the holy presence of Sree Sree Maa. Smt. Paul is a worthy disciple of the famous Rabindra Sangeet artist Smt. Suchitra Mitra.

7th June - 6th July - The ashramites got the chance to serve renowned saint Sri Sri Tatbaba of Pushkar, who was present in the ashram during these days.

20th June - Celebrating the birth anniversary of the earthly sojourn of Sree Sree Maa, Sri Guru puja was conducted in the morning at Sree Sree Annapurna Kshetra. In the afternoon, devotees received prasad. Bhajans were presented by our Guru-brothers and sisters in the evening.

26thJune - On this day, the nineteenth session of the 'Adhyatmik Sabha' was organised in the Ashram premises. In this session our Guru-brother Dr. Barun Dutta presented a discourse on the concept of the Upanishads.

Forthcoming Events

Janmastami: 25th August, Thursday
Spiritual Congregation: 25th September, Sunday, 7 pm
Mahalaya: 30th September, Friday
Navaratri Durga Puja: 1st to 11th October
6th October (Panchami): Evening Programme
8th October (Saptami): Evening Programme
9th October (Ashtami) : Food distribution in the afternoon on the occasion of Lahiri Mahasaya's death anniversary.
10th October (Navami) : Mahaprasad of Sree Sree Durga Devi will be distributed in the afternoon.
Kojagari Laxmi Puja: 15th October, Saturday